অনুশীলন পদ্ধতি

১ম পরিচ্ছেদ

বিশুদ্ধিতা লাভের উপায়

১
মনের বিশুদ্ধিতা

১। মানুষেরা সাধারণত বৈষয়িক কাজে লিপ্ত, যা তাদেরকে মোহাসক্ত করে এবং দুঃখ কষ্টের দিকে নিয়ে যায়। বৈষয়িক আসক্তি হতে মুক্তির পথ ৫ (পাঁচ) প্রকার। এগুলো হলো নিম্নরূপ ঃ

প্রথমতঃ তাদেরকে এ বিশ্বের সকল বস্তু সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হবে। ঐ ধারণা সতর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। এবং সঠিকভাবে বস্তুর কার্য-কারণ নীতির মর্মার্থ বুঝতে হবে। দুঃখের প্রকৃত কারণ হচ্ছে বৈষয়িক আসক্তি। ঐ আসক্তি জন্ম নেয় অহংকার মূলক ভ্রান্ত ধারণা থেকেই। এ কারণে মানুষ কার্য-কারণ নীতির মর্মার্থকে উপলব্ধি করতে পারে না। সুতরাং বৈষয়িক আসক্তির এ ভ্রান্ত ধারণার মূল উৎপাটনের মাধ্যমেই মনের প্রকৃত শান্তি আনয়ন সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ মানুষেরা এ ভ্রান্ত ধারণা এবং বৈষয়িক আসক্তি থেকে সতর্কতা এবং সহিষ্ণুতার মাধ্যমে মানসিক সংযমতার দ্বারা বের হয়ে আসতে সক্ষম। কার্যকর মানসিক সংযমতার দ্বারা তারা চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এবং শরীরের মাধ্যমে ক্রমাগত যে আসক্তির উৎপত্তি হয় তা বর্জন করতে পারে এবং এভাবে পরে বৈষয়িক আসক্তির মূল উৎপাটন করতে পারে।

তৃতীয়তঃ বস্তুর ব্যবহারেও তাদের সঠিক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। ধরা যাক, খাদ্য দ্রব্য এবং কাপড়চোপড়ের কথা। এগুলোর ব্যবহার আরাম আয়েশের জন্য নয়, শরীরের প্রয়োজনে। কাপড় প্রয়োজন হয় শরীরকে গরম ও ঠান্ডা হতে রক্ষা করার জন্যে এবং লজ্জাজনক স্হান আচ্ছাদনের জন্যে। আর খাদ্যের প্রয়োজন হয় যখন সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভের আশায় অনুশীলন করে তখন শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে।

এভাবে চিন্তা করলে বৈষয়িক আসক্তি উৎপন্ন হয় না।

চতুর্থতঃ মানুষের সহিষ্ণুতা শিক্ষা করা উচিৎ। তাদের উচিৎ গরমে ও শীতে, ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় সাময়িক কষ্ট হলেও তা দৃঢ়তার সাথে সহ্য করা। তাদের উচিৎ যখন তারা অপব্যবহার ও অবজ্ঞার সম্মুখিন হয় তখন ধৈর্য্য ধারণ করা। ইহাই সহিষ্ণুতা চর্চার নিয়ম। এ সহিষ্ণুতার দ্বারা বৈষয়িক আসক্তির আগুনে প্রতিনিয়ত প্রজ্জ্বলিত দেহকে প্রজ্জ্বলন থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

পঞ্চমতঃ মানুষের উচিৎ সকল প্রকার বিপদকে জানা এবং ত্যাগ করা। যেমন বিজ্ঞ ব্যক্তি হিংস্র অশ্ব এবং পাগলা কুকুর থেকে দূরে থাকে, তেমনি মানুষের উচিৎ নয় খারাপ লোকের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং বিজ্ঞজনেরা গমনাগমন করে না এমন স্হানও ত্যাগ করা উচিৎ। যদি কেহ সতর্কতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে জীবন যাপন করে থাকে, তাহলে বৈষয়িক আসক্তিও সহজেই নির্বাপিত হয়।

২। এ পৃথিবীতে ৫ প্রকারে তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। যেমনঃ ক) দর্শনের মাধ্যমে, খ) শ্রবণের মাধ্যমে, গ) ঘ্রানের মাধ্যমে, ঘ) জিহ্বার মাধ্যমে এবং ঙ) স্পর্শের মাধ্যমে। এই ৫ প্রকার তৃষ্ণা ৫ প্রকার দরজার মাধ্যমে আমাদের শরীরে আরাম আয়েশ সৃষ্টি করে।

চক্ষুযোগলের দ্বারা দর্শন, কানের দ্বারা শ্রবণ, নাকের দ্বারা ঘ্রাণ, জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন এবং স্পর্শ অনুভূতির দ্বারা তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। তৃষ্ণার কারণে শরীরের প্রতি ভালবাসা এবং আরাম-আয়েশ উক্ত পঞ্চদ্বারের মাধ্যমে আগমন করে।

বেশীরভাগ লোকেরা শারীরিক আরাম আয়েশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ আরাম আয়েশের পিছনে যে অকুশল বা দুঃখ জড়িত আছে তা বুঝতে পারে না। ফলে বনে শিকারী যেমন হরিণকে ফাঁদে ফেলে ধরে নিয়ে যায় এবং পরে কষ্ট দেয় তদ্রুপ অকুশলের বা দুঃখের ফাঁদে পড়ে মানুষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে। এ ৫ প্রকার তৃষ্ণার দরজার মধ্যে ইন্দ্রিয়জাত তৃষ্ণা সবচেয়ে বেশী বিপদজনক ফাঁদ। যখন মানুষেরা এদের ফাঁদে পড়ে তখন বৈষয়িক আসক্তির জালে আবদ্ধ হয়ে কষ্টভোগ করে।

তাদের জানা উচিৎ যে কিভাবে এ মরণ ফাঁদের মূলোৎপাটন করা যায়।

৩। বৈষয়িক আসক্তির ফাঁদ থেকে মুক্তির পথ শুধু একটি নয়। যদি কেহ একটি সাপকে, একটি কুমিরকে, একটি পাখিকে, একটি কুকুরকে, একটি শৃগালকে অথবা একটি বানরকে ধরে এবং পরে একই রশিতে শক্ত করে আবদ্ধ করে ছেড়ে দেয়, তাহলে ৬টি প্রানী তাদের নিজেদের স্ব স্ব উপায়ে স্ব স্ব অবস্হানে ফিরে যেতে চেষ্টা করবে। সাপ তৃণাবৃত স্হানে, কুমির জলে, পাখি মুক্ত আকাশে, কুকুর গ্রামে, শৃগাল জংগলে, এবং বানর বনের গাছে ফিরে যেতে চেষ্টা করবে। যদিও তারা প্রত্যেকেই নিজস্ব গতিতে চলতে চাইবে, কিন্তু যেহেতু তারা একটি রশিতেই আবদ্ধ সেহেতু যার শক্তি যত বেশী তাকেই অনুসরণ করতে হবে অন্যান্যদেরকে।

এ গল্পের ন্যায় মানুষেরাও তার বিভিন্ন পদ্ধতিতে চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, শরীর ও মন এ ৬ প্রকার তৃষ্ণা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে এবং যখন যেটার শক্তি প্রবল হয়ে দেখা দেয় তখন সেটার দ্বারাই প্রভাবিত হয় এবং পরিচালিত হয়।

যদি ঐ ৬ প্রকার প্রানীকে কোন স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখে তাহলে তারা মুক্ত হওয়ার জন্যে আপ্রান চেষ্টা করবে এবং পরিশ্রান্ত হয়ে নীরবে বসে পড়বে। একইভাবে মানুষেরা যদি তাদের মনকে সংযত করতে পারে তাহলে অন্য ৫টি ইন্দ্রিয়ও আপনাআপনি সংযত হতে বাধ্য। যদি মনকে দমন করা যায় তাহলে ইহলোকে এবং পরলোকেও শান্তি সুখ ভোগ করা যায়।

৪। মানুষেরা স্বার্থপরতায় আনন্দ পায়, তারা যশঃ এবং প্রশংসাকে ভালোবাসে। কিন্তু যশঃ এবং প্রশংসা সুগন্ধীর ন্যায় দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। যদি মানুষেরা সম্মান ও প্রশংসার পিছনে ধাবিত হয়ে সত্য পথ থেকে সরে পড়ে তাহলে তারা অত্যন্ত বিপদজনক পথে অগ্রসর হয় এবং শীঘ্রই অনুতাপে পতিত হয়ে মনঃপীড়া ভোগ করে।

যদি কেহ যশঃ সম্পদ ও ভালোবাসার পিছনে ধাবিত হয় তাহলে সেটা হবে ধারালো ছুরির ফলা থেকে শিশুর মধু লেহনের ন্যায়। যখন সে মধুর আস্বাদন গ্রহণ

করবে তখন সে তার জিহ্বাকেও যন্ত্রণার মুখে ঠেলে দেবে। সেটা হলো প্রবল বাতাসের প্রতিকূলে মশাল বহনকারী মানুষের ন্যায়; যা তার হাত এবং মুখমন্ডলকে ঝলসিয়ে দেবে।

লোভ, দ্বেষ ও মোহতে পরিপূর্ণ নিজের মনকেও বিশ্বাস করা ঠিক নয়। নিজের মনকে তৃষ্ণার মাঝে ছেড়ে দেয়া মোটেই উচিৎ নয়। তাকে শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

৫। সম্পূর্ণরূপে মনকে নিজের আয়ত্তে আনা সত্যিই কঠিন। যারা সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভী তাঁদেরকে প্রথমেই সকল প্রকার তৃষ্ণার আগুন থেকে বের হয়ে আসতে হবে। তৃষ্ণা হলো ক্ষিপ্ত আগুনের ন্যায় এবং যারা সর্বজ্ঞতাজ্ঞানের অনুসন্ধানী তাদেরকে অবশ্যই এ তৃষ্ণা রূপ আগুন পরিত্যাগ করতে হবে। ইহা ভারী খড় বহনকারী একজন লোক আগুনের স্ফুলিঙ্গ থেকে খড়কে রক্ষা করার ন্যায়।

কিন্তু যদি কেহ সুন্দর বস্তুতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে তাহলে সে বোকার মত কাজ করবে। মনই সমস্ত কিছুর প্রধান, যদি মনকে নিজের আয়ত্তের মাঝে রাখা যায় তাহলে দুর্বল তৃষ্ণা সহজেই অদৃশ্য হয়ে যায়।

সর্বজ্ঞতা লাভের পথ সত্যিই কঠিন কিন্তু ঐ পথ অনুসন্ধানের মানসিকতা না থাকলে ইহা আরো বেশী কঠিন হয়ে পড়ে। সর্বজ্ঞতাজ্ঞান ব্যতীত এ জীবনে এবং মৃত্যুর পরেও দুঃখের শেষ নেই।

যখন কোন ব্যক্তি সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অর্জনে চেষ্টা করেন, তখন তা কাঁধের মধ্যে বলদের ভারী গাড়ী টানার ন্যায় মনে হয়। যদি বলদ অন্য কিছুতে মনোযোগ না দিয়ে এক মনে চেষ্টা করে, তাহলে কাদা মাটি অতিক্রম করে বিশ্রাম নিতে পারে। তদ্রুপ মনকে যদি সংযম করা যায় এবং সঠিক পথে ব্যবহার করা যায় তাহলে লোভমূলক কোন কাদায় পড়তে হবে না এবং যন্ত্রণাও ভোগ করতে হবে না।

৬। যারা সত্যিই সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অর্জন করতে চায় তাদেরকে প্রথমে অবশ্যই

বিশুদ্ধিতা লাভের উপায়

সর্বপ্রকার অহংকার থেকে মুক্ত হতে হবে এবং বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে বুদ্ধের শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে। পার্থিব জীবনের সকল প্রকার সম্পদ, স্বর্ণালংকার, রূপা ও সম্মান এগুলোর সাথে প্রজ্ঞা ও সৎকর্ম জনিত পুণ্যের তুলনা করা যায় না।

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া, পরিবারে শান্তি আনয়ন করা এবং প্রত্যেকের জন্যে শান্তি নিশ্চিত করতে হলে প্রথমে নিজেকেই নিয়মানুবর্তীতার মাধ্যমে জীবন যাপন করতে হবে। যদি কেহ তার মনকে সংযমতার মধ্যে রাখতে পারে, তাহলে সে সর্বজ্ঞতাজ্ঞান উপলব্ধির পথ খুঁজে পাবে এবং সকল প্রকার প্রজ্ঞা ও সৎকাজ জনিত পুণ্য আপনাআপনি তার কাছে উপস্থিত হবে।

ইহা পৃথিবীর অনাবৃত সম্পদের ন্যায়। পুণ্যের উৎপত্তি হয় সৎ কাজ থেকে এবং প্রজ্ঞার উৎপত্তি হয় পবিত্র ও শান্ত মন থেকে। নিরাপদ জীবনযাপনের জন্যে প্রজ্ঞাময় আলো এবং পুণ্যময় পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন হয়।

বুদ্ধের শিক্ষা মানুষকে লোভ, দ্বেষ, এবং মোহ পরিহার করতে শিক্ষা দেয়, যা একটি অতি উত্তম শিক্ষা। যারা এ শিক্ষা গ্রহণ করবে তারা জীবনে সুখ শান্তি ভোগ করবে।

৭। মানুষেরা সাধারণত নিজের চিন্তা প্রবণতার দ্বারা ধাবিত হয়। যদি তারা মনে লোভকে পোষণ করে তাহলে তারা প্রচন্ড লোভী হয়; যদি তারা রাগ চিত্ত পরায়ণ হয় তাহলে তারা প্রচন্ড রাগী হয়; আর যদি মোহপরায়ণ হয় তাহলে প্রচন্ড মোহান্ধ হয়ে পড়ে। এভাবে চিন্তা যে দিকে যায় শরীরও সে দিকে ধাবিত হয়।

ফসল সংগ্রহের সময় কৃষকেরা যেমন গরুর দলকে একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে ঘিরে রাখে, যাতে ঐ সীমানা অতিক্রম করে অন্যের কিছু ক্ষতি সাধন করতে না পারে। আবার আবদ্ধ গরুগুলোর মৃত্যুর কারণ যাতে সৃষ্টি না হয়, তার উপরও সজাগ দৃষ্টি রাখে। ঠিক একইভাবে মানুষেরও উচিৎ সতর্কতার সাথে মনকে পাহারা দেয়া, যাতে মনে খারাপ কিছুর উৎপত্তি না হয় এবং দুর্ভাগ্যের কবলে পড়তে না হয়। তাদেরকে লোভ, দ্বেষ, ও মোহের চিন্তা পরিহার করে দানশীলতা ও দয়া-

দাক্ষিণ্যতার দিকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

যখন বসন্ত কাল আসে তখন পশুচারণ ভূমিতে প্রচুর সবুজ ঘাস দেখা যায়। কৃষকেরা তখন গরুর দলকে সহজেই ছেড়ে দেয়; কিন্তু তারপরেও সতর্ক দৃষ্টি রাখে। তদ্রুপ মানুষের মনও যতই সংযমতার মাঝে থাকুক না কেন সর্বদা পর্যবেক্ষনের মাঝে রাখা উচিৎ।

৮। এক সময় শাক্যমুণি বুদ্ধ কৌসাম্বীক নগরে অবস্হান করছিলেন। ঐ নগরে বুদ্ধের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং উৎকোচ গ্রহণকারী এক পাপী লোক তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা গল্প প্রচার করতে লাগলো। এমতাবস্হায় বুদ্ধের শিষ্যদের পরিমাণমত খাদ্যদ্রব্য পেতেও অসুবিধা হচ্ছিল এবং পুরো শহর ব্যাপী তাঁদেরকে অপব্যবহার করা হচ্ছিল।

তখন আনন্দ বুদ্ধকে বললেন, "এরূপ শহরে আমাদের অবস্হান অনুচিত। আমাদের অন্য একটি উত্তম শহরে গমন করা উচিৎ। এই শহর আমদের ত্যাগ করা উচিৎ।"

বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে বললেন, "মনে কর অন্য শহরটিও এরূপ হলো, তখন আমরা কি করবো ?"

আনন্দ বললেন, "তখন আমরা অন্য একটি শহরে গমন করবো।"

তখন বুদ্ধ বললেন, "না আনন্দ, এভাবে এ পথের সমাধান হবে না। আমাদের উচিৎ ধৈর্য্য সহকারে এই অপবাদের অবসান হওয়া পর্যন্ত এই শহরে অবস্হান করা এবং তারপরে অন্য শহরে গমন করা।"

"এ পৃথিবীতে লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, এবং সুখ-দুঃখ বিদ্যমান, কিন্তু সর্বজ্ঞ বুদ্ধ এই বাহ্যিক বস্তু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এগুলো যেভাবে উদয় হয়েছে ঠিক সেভাবেই বিলয় হবে।"

২

চারিত্রিকতার সৎ দিকগুলো

১। যারা সর্বজ্ঞতাজ্ঞানের অনুসন্ধানী তাদেরকে সর্বদা অবিচলিতভাবে কায়, মন ও বাক্যের পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে। শরীর পরিশুদ্ধিতার জন্যে, প্রাণ আছে এমন কিছু হত্যা হতে বিরত থাকতে হবে। চুরি করা এবং ব্যভিচার হতে বিরত থাকতে হবে। মনের পরিশুদ্ধিতার জন্যে তাঁকে সকল প্রকার লোভ, দ্বেষ ও মিথ্যা দৃষ্টি থেকে বিরত থাকতে হবে এবং পরিশেষে বাক্য পরিশুদ্ধিতার জন্যে তাকে মিথ্যা বলা, অপব্যবহার করা, প্রতারণা করা, এবং বাজে গল্প বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

যদি কারো মনের বিশুদ্ধিতা নষ্ট হয় তাহলে অবশ্যই তার কাজেও বিশুদ্ধিতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। যদি কলুষিত মনে কাজ করে, তাহলে দুঃখ তাকে গ্রাস করে। সুতরাং শরীর ও মনকে সর্বদা পরিশুদ্ধিতার মাঝে রাখাটাই সর্বোত্তম কাজ।

২। একদা এক দয়ালু, বিনয়ী ও ভদ্র বিধবা মহিলা এক শহরে বাস করতেন। তাঁর একজন গৃহ পরিচারিকা ছিল, যে জ্ঞানী ও পরিশ্রমী।

একদিন গৃহ পরিচারিকা চিন্তা করলেন, "আমার গৃহকর্ত্রীর ভালো সুনাম আছে; আমি আসলে জানতে চাই তিনি কি সত্যি সত্যিই সৎ প্রকৃতির মহিলা, নাকি তাঁর পারিপার্শ্বিকতার জন্যেই তাঁকে সুনাম করা হচ্ছে। আমি তাঁকে পরীক্ষা করবো এবং তা উদ্ঘাটন করবো।"

পরের দিন পরিচারিকা দুপুর পর্যন্ত তার গৃহকর্ত্রীর সম্মুখে উপস্থিত হলো না। গৃহকর্ত্রী এতে উত্তেজিত হয়ে উচ্চ কন্ঠে তাকে তিরস্কার করতে লাগলেন। তখন পরিচারিকা প্রত্যুৎত্তরে বললো, "যদি আমি ১/২ দিন অলসতা করি এতে আপনার অধৈর্য্য হওয়া উচিৎ নয়।" এই কথা শুনে গৃহকর্ত্রী ক্রোধান্বিত হলেন।

পরের দিন পুনরায় পরিচারিকা দেরীতে শয্যা ত্যাগ করলেন। এতে গৃহকর্ত্রী রাগান্বিত হয়ে তাকে লাঠি পেটা করলেন। এই ঘটনা সহসা সবার মুখে মুখে প্রচারিত হলো এবং ধনী বিধবার সুনাম ক্ষুন্ন হলো।

৩। সাধারণত এই মহিলার ন্যায় অনেক লোক আছে। যখন তাদের চারিপাশে সবকিছু ভালো থাকে তখন তারা দয়ালু, ভদ্র এবং শান্ত থাকে। কিন্তু বিজ্ঞতার সাথে যদি কেহ তাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তাহলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারা উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

অপবাদের সময়ে, ক্রোধভাব প্রদর্শনের সময়ে, খাদ্যাভাবের সময়ে, কাপড়-চোপড় ও বাস স্থানের সমস্যার সময়ে যদি কেহ পরিশুদ্ধ মন ও শান্ত দেহে সৎ কাজ করে যায় তখন তাকে আমরা সৎ লোক হিসেবে ধরে নিতে পারি।

সুতরাং যারা শুধুমাত্র পারিপার্শ্বিক ভালো সময়ে ভালো কাজ করে এবং সংযমতা অবলম্বন করে, তারা আসলেই সৎ লোক নয়। শুধু মাত্র যারা বুদ্ধের শিক্ষাকে গ্রহণ করে এবং ঐ শিক্ষাকে তাদের দেহ ও মনের মাধ্যমে চর্চা করে তারাই প্রকৃত সৎ, নম্র ও শান্তিপ্রিয় লোক।

৪। যথাযোগ্য সময়ে ব্যবহারের জন্য পাঁচ প্রকার জোড়া বিপরিতার্থক শব্দ রয়েছে। যেমন, শব্দ ব্যবহারের উপযুক্ত সময় এবং অনুপযুক্ত সময়; সঠিক শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থার বর্ণনা এবং তার বিপরীত; কোমল শব্দ ব্যবহার এবং কর্কশ শব্দ ব্যবহার; মঙ্গলকর শব্দ ব্যবহার এবং অমঙ্গলকর শব্দ ব্যবহার এবং সহানুভূতিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার ও বিদ্বেষপূর্ণ শব্দ ব্যবহার।

যে কোন শব্দ ব্যবহারে আমাদেরকে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন কারণ এতে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ ভালো এবং খারাপ কাজে অগ্রসর হয়। যদি আমাদের মন সহানুভূতি ও করুণাময় হয় তাহলে খারাপ কথা শুনলেও মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। আমাদের মুখ দিয়ে কর্কশ শব্দ ব্যবহার না করলে অন্যের রাগ এবং দ্বেষ ভাব উৎপন্ন হবে না। আমরা যে শব্দ ব্যবহার করি তা সর্বদা

বিশুদ্ধিতা লাভের উপায়

সহানুভূতিপূর্ণ এবং জ্ঞানময় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যেমন কোন ব্যক্তি একটি পুরো মাঠ থেকে সমস্ত কাদা সরিয়ে ফেলতে চায়, এ কাজে সে একটি কোদাল এবং ধুলা-বালি পরিস্কার করার জন্যে একটি কুলা ব্যবহার করে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে মাঠটি পরিস্কার করতে চাইলো। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা একটা অসম্ভব কাজ। এই নির্বোধের ন্যায় আমরা আমাদের সকল প্রকার আচার-ব্যবহারে সহানুভূতিপূর্ণ বাক্যের প্রয়োগ করতে পারবো, একথাও বলা যায় না। আমাদের উচিৎ মনে সংযমতা আনয়ন করা এবং অপরের প্রতি সহানুভূতি-পরায়ণ হওয়া। এরূপ হলে নিজের কথার দ্বারা অপরকে কষ্ট দেয়া হয় না এবং অপরের কাছ থেকেও কষ্টকর কথা শুনতে হয় না।

কেহ যদি জলের রং এর ন্যায় একটি ছবি নীল আকাশে অংকন করতে চায় তা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি বড় নদীর জলরাশিকে টর্চলাইটের রশ্মি দ্বারা জলশূন্য করাও সম্ভব নয়। অথবা দুই টুকরা ভালো চামড়ার ঘর্ষনের মাধ্যমে চটপট আওয়াজ সৃষ্টি করেও নদী জলশূন্য করা যায় না। তদ্রুপ সকলের উচিৎ নিজের মনকে সংযত করা; ফলে যেরূপ কথাই শ্রবণ করুক না কেন মনে অস্থিরভাব সৃষ্টি হবে না।

মানুষের উচিৎ তাদের মনকে পৃথিবীর ন্যায় প্রসারিত করা, আকাশের ন্যায় বিস্তার করা, গভীর নদীর জলের ন্যায় নিগূঢ় ধ্যানে নিমগ্ন রাখা এবং নরম উত্তম চামড়ার ন্যায় সোজা করে রাখা।

যদি কোন শত্রু কাকেও অসহ্য যন্ত্রণা দেয় এবং সে যদি এতে বিরক্তবোধ করে, তাহলে সে বুদ্ধের শিক্ষাকে অনুশীলন করছে না। যে কোন সময়ে চিন্তা করতে হবে যে, "আমার মন স্থির; আমার মুখ হতে দ্বেষযুক্ত এবং রাগযুক্ত বাক্য বের হবে না। আমি সহানুভূতি এবং সমবেদনার মাধ্যমে শত্রুদের মধ্যে অবস্থান করবো এবং এভাবে সমস্ত প্রাণীর প্রতি করুণাভাব প্রদর্শন করবো।"

৫। এক সময় এক ব্যক্তি একটি গল্প বললেন। গল্পটি হলো নিম্নরূপঃ লোকটি একটি উঁই পোকার ঢিবি দেখলেন; যা দিনের বেলায় জ্বলে এবং রাত্রিবেলা ধোঁয়ায়িত

হয়। তিনি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট গিয়ে এ ব্যাপারে তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করলেন। বিজ্ঞ লোকটি একটি খড়্গের দ্বারা উঁইপোকার ঢিবিটি খুঁড়তে বললেন। অতঃপর লোকটি তাই করলেন। এতে প্রথমে তিনি একটি পুরানো দরজার খুঁটি দেখতে পেলেন। তারপর বুদবুদ করছে এমন কিছু জল; খড়নিক্ষেপনার্থ কাঁটাওয়ালা দণ্ডবিশেষ, একটি বক্স, একটি কচ্ছপ, একটি কসাই কাজের ছুরি, এক টুকরা মাংস এবং পরিশেষে একটি পৌরানিক দানব বের হয়ে আসলো। লোকটি যা দেখলেন তা বিজ্ঞ ব্যক্তিকে অবহিত করলেন। বিজ্ঞ লোকটি এগুলোর মর্মার্থ ঐ লোকটিকে বর্ণনা করলেন এবং বললেন, "পৌরাণিক দেবতা বাদে অন্যান্য সব ফেলে দিন এবং পৌরাণিক দেবতাকে কোন ঝামেলা না করে একা থাকতে দিন।"

এখানে "উঁইপোকার ঢিবি" মানে মানুষের শরীরকে বুঝানো হচ্ছে। "দিনের বেলায় জ্বলে" মানে দিনে মানুষেরা পূর্বরাত্রে যা ভাবে তা সম্পাদন করে থাকে একে বুঝানো হচ্ছে। "রাত্রে ধোঁয়ায়িত হয়" মানে দিনে সম্পাদিত আনন্দজনক এবং দুঃখময় কাজের কথা তারা রাত্রে ভাবে একে বুঝানো হচ্ছে।

এ গল্পে "এক ব্যক্তি" মানে যিনি সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভের জন্যে চেষ্টা করছেন সেই বোধিসত্ত্বকেই বুঝানো হচ্ছে। "একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি" মানে স্বয়ং বুদ্ধকেই বুঝানো হচ্ছে। "একটি কোঁদাল" মানে প্রকৃত প্রজ্ঞাকেই বুঝানো হচ্ছে। "মাটি খোঁড়া" মানে উদ্যমতাকে বুঝানো হচ্ছে যার মাধ্যমে সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অর্জন সম্ভব।

পুনঃ ঐ গল্পে "দরজার খুঁটি" মানে অবিদ্যার কথাকে, "বুদবুদ" মানে দুঃখ ও রাগকে বুঝানো হয়েছে। "কাঁটাওয়ালা দন্ড"দ্বারা অস্থিরতা এবং অস্বচ্ছন্দতাকে, "বক্সের" মাধ্যমে লোভ, দ্বেষ, মোহ, পরিবর্তনশীলতা, অনুশোচনা ও অলসতাকেই বুঝানো হয়েছে। "কচ্ছপের" মাধ্যমে শরীর এবং মনকে, "কসাইর ছুরি"র মাধ্যমে পঞ্চস্কন্ধের কথা, এবং "একটি মাংসের টুকরা"র মাধ্যমে লালসা চরিতার্থকরণে মানুষের তৃষ্ণাকে বুঝানো হচ্ছে। এগুলো সবই মানুষের জন্যে দুঃখ উৎপাদন করে তাই বুদ্ধ সবগুলোকে বর্জন করতে বলেছেন।

অবশেষে বাকী থাকে "পৌরাণিক দেবতা," যার মাধ্যমে পার্থিব লালসা মুক্ত

বিশুদ্ধিতা লাভের উপায়

মনের কথাই বলা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি নিজের মাঝেই অনুসন্ধানী হয়ে কিছু খুজঁতে থাকে তাহলে তার মাঝে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হবে এবং পরিশেষে সে মুক্ত মন তৈরী করতে পারবে। "পৌরাণিক দেবতাকে একা থাকতে দাও" মানে পার্থিব লালসামুক্ত মন গড়ে তোলার কথাই এখানে বলা হয়েছে।

৬। পিন্ডুলা নামক বুদ্ধের এক শিষ্য, জ্ঞান অর্জনের পর নিজের জন্মস্হান কৌশাম্বিকে ফিরে গিয়ে তাদের সাহায্য সহযোগিতার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তাঁর একাজের মাধ্যমে তিনি বুদ্ধাঙ্কুর বপনের ক্ষেত্র তৈরী করেছিলেন।

কৌশাম্বিকের সীমান্তে একটি ছোট্ট বাগান ছিল; যার পাশ দিয়ে গঙ্গানদী প্রবাহিত এবং সারি সারি নারিকেলের বাগানে পরিপূর্ণ এবং সেখানে সর্বদা শীতল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে।

এক গ্রীষ্মের দিনে পিন্ডুলা ঐ বাগানের একটি গাছের সুশীতল ছায়ার নীচে ভাবনারত ছিলেন। ঐ সময়ে রাজা উদয়নও একই বাগানে স্বস্ত্রীক অবসরকালীন বিনোদনে গিয়ে গান-বাজনা ও বিনোদনের পরে অন্য একটি গাছের নীচে ঘুমাচ্ছিলেন।

তখন স্ত্রী সহ অন্যান্য সহচরিরা ঐ বাগানে পরিভ্রমণের সময়ে হঠাৎ পিন্ডুলাকে ভাবনারত অবস্হায় দর্শন করে তাঁর কাছে আসলেন। তারা তাঁকে একজন পবিত্র লোক হিসেবে মনে করলেন এবং তাদেরকে ধর্মদেশনা করতে প্রার্থনা জানালেন। এতে পিন্ডুলা সাড়া দিয়ে দেশনা শুরু করলেন।

রাজা যখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন তাঁর পাশে স্ত্রীসহ অন্যান্য সহচরিদেরকে না দেখে তাদেরকে খুঁজতে লাগলেন এবং পরে দেখলেন যে তারা পিন্ডুলার চারিপার্শ্বে বসে ধর্মদেশনা শ্রবণ করছেন। ঈর্ষা ও লালসাযুক্ত মনে রাজা রাগান্বিত হয়ে পিন্ডু-লাকে বললেন, "আপনি একজন পবিত্র ব্যক্তি হয়েও মহিলাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তাদের সাথে তুচ্ছ আলোচনা করছেন।" পিন্ডুলা কিন্তু শান্তভাবে চোখ বন্ধ করে নীরবতা অবলম্বন করলেন।

এতে রাজা আরও বেশী রেগে গিয়ে তরবারি বের করে পিন্ডুলাকে ভয় দেখালেন। এতেও পিন্ডুলা নীরব এবং পাথরের ন্যায় অনড় অবস্থায় রইলেন। এ অবস্থা দর্শন করে রাজা আরও বেশী রাগান্বিত হলেন এবং উঁইপোকার ঢিবি ভেংগে এক টুকরা মাটি পিন্ডুলার দিকে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু এতেও পিন্ডুলা নীরবে ভাবনা চালিয়ে গিয়ে দৃঢ়তার সাথে অপমান ও বেদনা সহ্য করেছিলেন।

পরিশেষে, রাজা তাঁর উগ্রতার জন্যে লজ্জিত হয়ে পিন্ডুলার নিকট ক্ষমা চাইলেন। এ ঘটনার কারণে রাজপ্রাসাদে বুদ্ধের শিক্ষা প্রবেশ করলো এবং পরবর্তিতে তা পুরো রাজ্যব্যাপী প্রসারিত হলো।

৭। কিছুদিন পর রাজা উদয়ন পিন্ডুলাকে দর্শন করার জন্যে তাঁর অরণ্য ধ্যানকেন্দ্রে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,"বুদ্ধের শিষ্যরা কিভাবে তাদের দেহ ও মনকে কাম লালসা থেকে রক্ষা করে ? যদিও তারা সবাই যুবক।"

পিন্ডুলা প্রত্যুত্তরে বললেন,"হে রাজন ! বুদ্ধ সকল মহিলাকে সম্মান করতে বলেছেন। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছেন, সকল বৃদ্ধ মহিলাদেরকে মা হিসেবে দেখতে; তরুনীদেরকে নিজের বোন হিসেবে এবং ছোটদেরকে নিজের কন্যা হিসেবে দেখতে বলেছেন। এ কারণেই বুদ্ধের শিষ্যগণ তরুন হলেও তাঁদের দেহ মনকে কাম লালসার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন।"

রাজা পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন,"কিন্তু ভন্তে, একজন লোকের মনে খারাপ চিন্তাতো আসতেই পারে মা, বোন, কন্যারূপী মহিলার প্রতিও। তখন কিভাবে বুদ্ধের শিষ্যরা তাদের কাম লালসাকে দমন করেন ?"

"হে রাজন ! বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, তাদের শরীরে রক্ত, মাংস, পূঁজ, ঘাম, এবং তৈলজাত সমস্ত কিছুই ঘৃণিত ও দুর্গন্ধময়। এভাবে নিজের ও পরের দেহকে দর্শন করলে তাঁর শিষ্যগণ তরুন হলেও কাম লালসা হতে মনকে মুক্ত রাখতে পারেন।"

বিশুদ্ধিতা লাভের উপায়

তারপরেও রাজা বললেন, "ভন্তে, আপনি যেহেতু ভাবনা চর্চা করছেন এবং ভাবনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন সেহেতু ইহা আপনার জন্যে সহজ মনে হলেও, যারা এখনও ভাবনা চর্চা করেনি তাদের জন্যে তা কষ্টকর নয় কি ? তারা যদিও এ দেহ ঘৃণিত ও দুর্গন্ধময় হিসেবে দর্শন করে, কিন্তু তবুও তাদের চোখের সম্মুখে সুন্দর অবয়ব উপস্থিত হয়। তারা ঐ সুন্দর অবয়বকে কদাকার হিসেবে দর্শন করলেও কাম লালসায় প্রবৃত্ত হয়ে সুন্দর রূপটাকেই উপভোগ করবে। মনে হয় অন্য কোন কারণ আছে যার দ্বারা বুদ্ধের শিষ্যরা তরুন হলেও তাদের দেহ ও মনকে কাম লালসার হাত হতে রক্ষা করতে সক্ষম।"

পিন্ডুলা বললেন, "হে রাজন ! বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদেরকে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দরজাকে সর্বদা পাহারা দিতে বলেছেন। যখন সুন্দর অবয়ব ও রূপ চোখের মাধ্যমে, আনন্দদায়ক শব্দ কর্ণের মাধ্যমে, সুঘ্রাণ নাকের মাধ্যমে, স্বাদ আস্বাদন জিহ্বার মাধ্যমে, এবং নরম কিছু হাতের মাধ্যমে স্পর্শ করে তখন আমাদের উচিৎ নয় যে, এগুলোর মাধ্যমে আসক্তিপরায়ণ হওয়া। আবার যখন কদাকার কিছু দর্শন করে, শোনে বা স্পর্শ করে, তার প্রতিও বিরক্তিভাব প্রদর্শন করা উচিৎ নয়। সতর্কতার সাথে এ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দরজাকে পাহারা দেয়ার কথা বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এই শিক্ষার মাধ্যমে তরুন শিষ্যরা তাদের দেহ ও মনকে কাম লালসার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন।"

এতে রাজা আনন্দিত হয়ে বললেন, "বুদ্ধের শিক্ষা সত্যিই মহান এবং পবিত্র। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, যখন আমি সুন্দর অথবা পছন্দনীয় কিছুর মুখামুখি হই, তখন আমি আমার ইন্দ্রিয় দরজাকে পাহারা দেই না; তাই ইন্দ্রিয়াবেগে উত্তেজিত হই। তাই, ইহা আমাদের একমাত্র কর্তব্য যে, নিজের দেহ ও মনকে পবিত্র রাখার জন্যে পঞ্চইন্দ্রিয়ের দরজাকে সর্বদা পাহারা দিয়ে রাখা।"

৮। যখন কোন ব্যক্তি তার চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করে তখন তার বিপরীতেও একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যদি কেহ দুর্ব্যবহার করে তাহলে প্রত্যুত্তরে তাকেও এর পরিণাম ভোগ করতে হয়। এ প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া নিজেকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। ইহা প্রতিকূল আবহাওয়াতে থুথু ফেলার ন্যায়; যা অন্যের গায়ে না পড়ে

নিজের গায়ে ফিরে আসে। ইহা বাতাসের প্রতিকূলে ঝাড়ু দ্বারা ধূলিকণা পরিস্কার করার ন্যায়; যা পরিস্কার না হয়ে নিজের শরীরকে ধূলায়িত করে। যে তৃষ্ণাকে প্রশ্রয় দেয়, প্রতিশোধ হিসেবে দুর্ভাগ্য সর্বদা তাকে অনুসরণ করে থাকে।

৯। লোভকে পরিত্যাগ করে পরোপকারের মনোভাব সৃষ্টি করা উত্তম কাজ। অধিকন্তু নিজের মনকে দৃঢ়তার সাথে আর্যপথের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক রত রাখা উচিৎ।

প্রত্যেকের উচিৎ অহংকারবোধ ত্যাগ করা; এবং সৎ ও পরোপকারের প্রতি মনমানসিকতা সৃষ্টি করা। এমন কাজ করতে হবে যাতে অন্যরা সুখি হয় এবং তার প্রভাবে যাতে অন্যান্যরাও সুখি হতে পারে। এরূপ কাজের মাধ্যমেও সুখের উৎপত্তি হয়।

একটি মোমবাতির আলো থেকে হাজার হাজার মোমবাতি প্রজ্জ্বলিত করা যায়; এতে কিন্তু মোমবাতির শিখা কমে যায় না। তদ্রুপ সুখও একসাথে ভাগাভাগি করে উপভোগ করলে কমে যায় না।

যারা সর্বজ্ঞতাজ্ঞানের অনুসন্ধানী তাদেরকে অবশ্যই প্রতি পদক্ষেপে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। যে যত বড় উচ্চাকাংখা পোষণ করুক না কেন, তা অবশ্যই ক্রমান্বয়ে অর্জন করা প্রয়োজন। আমাদের দৈনন্দিন জীবন ধারণ হতেই সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১০। সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভের পথে সর্বপ্রথম ২০টি জাগতিক বাঁধা আমাদেরকে অতিক্রম করতে হবে। এগুলো নিম্নরূপঃ-

ক) একজন দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে দান করা খুবই কষ্টকর ব্যাপার
খ) অহংকারী ব্যক্তির পক্ষে সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভ দূরহ ব্যাপার
গ) আত্ন উৎসর্গকারী ব্যক্তি না হলে সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভ কষ্টকর ব্যাপার
ঘ) বুদ্ধের উপস্হিতিতে জন্মগ্রহণ করা দূরহ ব্যাপার
ঙ) বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করা কঠিন ব্যাপার

চ) শরীরের সহজাত প্রবৃত্তি হতে মনকে মুক্ত রাখা কষ্টকর ব্যাপার

ছ) সুন্দর এবং আকর্ষনীয় বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া কষ্টকর ব্যাপার

জ) একজন যুবক তার ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার জন্যে শক্তি প্রয়োগ না করা খুবই কঠিন ব্যাপার

ঝ) যখন কেহ অপমানিত হয় তখন ক্রোধভাব প্রদর্শন না করা খুবই কঠিন ব্যাপার

ঞ) হঠাৎ কোন বেদতিক অবস্হার মধ্যে পরীক্ষায় পড়লে, না জানার ভান করে থাকা কঠিন ব্যাপার

ট) বিস্তারিত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কোন বিষয়ে জানার জন্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখা কষ্টকর ব্যাপার

ঠ) একজন নূতন শিক্ষার্থীকে অবজ্ঞা না করা কঠিন ব্যাপার

ড) নিজেকে সততার মধ্যে রাখা কঠিন ব্যাপার

ঢ) সৎ বন্ধু লাভ করা দূরহ ব্যাপার

ণ) সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অর্জনের দিকে নিয়ে যায় এমন নিয়ম-নীতি পালন করা কষ্টকর ব্যাপার

ত) শরীরের বাহ্যিক অবস্হার দ্বারা মন উত্তেজিত হবে না ইহা একটি দূরহ ব্যাপার

থ) মানুষের সক্ষমতা বুঝে তাদেরকে শিক্ষা দান করা খুবই কঠিন ব্যাপার

দ) প্রশান্ত মনে অবস্হান করা কষ্টকর ব্যাপার

ধ) ভাল এবং মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা খুবই কঠিন ব্যাপার এবং

ন) সঠিক শিক্ষা অর্জন এবং চর্চা করা খুবই কঠিন ব্যাপার

১১। ভাল এবং খারাপ লোক তাদের কাজের মাধ্যমে এবং স্বভাবের মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করে। খারাপ লোক খারাপ কাজকে খারাপ হিসেবে দর্শন করে না। যদি কেহ উক্ত খারাপ কাজ তাদের দৃষ্টিগোচরে আনে তবুও তারা সে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত হয় না; এবং যারা তাদের খারাপ কাজগুলোর কথা বলে তাদেরকেও সে পছন্দ করে না। বিজ্ঞলোকেরা সহজেই ভাল এবং মন্দের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে। তাদের দৃষ্টিতে যা খারাপ বলে মনে হবে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ত্যাগ করে। যদি কেহ তাদেরকে খারাপ দিকগুলো বলে দেয় তাহলে তারা

তাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপরায়ণ হয়।

এরূপে মৌলিকভাবে ভালো এবং খারাপ মানুষের মধ্যে প্রভেদ দেখা যায়। খারাপ লোক তাদের প্রতি প্রদর্শিত মায়া-মমতার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না; কিন্তু ভাল লোক তাদের প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ভাল লোক শুধু তাদের উপকারীর প্রত্যুপকারই করেন না, অন্যান্য লোকদের প্রতিও অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন।

৩

পৌরাণিক রূপকথার আলোকে বুদ্ধের শিক্ষা

১। একদা একদেশে অদ্ভুত এক রীতি ছিল। ঐ দেশের লোকেরা বয়োঃবৃদ্ধদেরকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং অগম্য পাহাড়ে রেখে আসতেন।

রাজ্যের এক মন্ত্রী এ প্রথা অনুসরণ করতে খুবই কষ্ট অনুভব করলেন। কারণ তাঁর বৃদ্ধ পিতাকেও ঐ প্রথানুসারে অগম্য পাহাড়ে রেখে আসতে হবে। মন্ত্রী একটি গোপন গর্ত খনন করে সেখানে পিতাকে রেখে সেবাযত্ন করতে লাগলেন।

একদিন ঐ রাজ্যের রাজার সম্মুখে একজন দেবতা এসে উপস্থিত হলেন এবং রাজাকে এক কঠিন প্রশ্নের মুখামুখি করলেন। দেবতা রাজাকে বললেন, "আপনি যদি আমার দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক সমাধান দিতে না পারেন, তাহলে আপনার রাজ্য ধ্বংস করে দেয়া হবে।" প্রশ্নগুলোর প্রথমটি হলো, "এখানে ২টি সর্প আছে; কোনটি পুরুষ এবং কোনটি স্ত্রী তা আমাকে বলুন।"

রাজা অথবা উপস্থিত কেহই উক্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারলেন না। সুতরাং রাজা রাজ্যের মধ্যে যে কোন কেহ যদি উক্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে, তাহলে তাকে বিশেষ পুরস্কারের ঘোষণা দিলেন।

বিশুদ্ধিতা লাভের উপায়

মন্ত্রী তাঁর পিতাকে রক্ষিত গোপন স্থানে গিয়ে উক্ত প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলেন। পিতা উত্তরে বললেন, "ইহা অতীব সহজ; সর্প দু'টিকে একটি নরম কার্পেটের উপরে রাখবে। যেটি নড়া চড়া করবে সেটি পুরুষ সর্প, আর যেটি শান্ত অবস্থায় অবস্থান করবে সেটি হবে স্ত্রী সর্প।" মন্ত্রী উত্তরটি রাজার কাছে নিয়ে গেলেন এবং সফলতার সাথে প্রথম প্রশ্নের সমাধান দিলেন।

এরপর দেবতা রাজাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন। রাজা এবং তাঁর অধিনস্হ কেহই উক্ত প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। ঐ প্রশ্নের জবাবও মন্ত্রী তাঁর পিতার সাথে পরামর্শ করে সমাধান দিলেন।

নিম্নে দেবতা দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর কিছু অংশ এবং প্রত্যুৎত্তর দেয়া গেল।

"নিদ্রায়িত ব্যক্তিকে জাগ্রত, এবং জাগ্রত ব্যক্তিকে নিদ্রায়িত বলে যে বলা হয়, সে কে ?" তার উত্তর হলো, "নিদ্রায়িত হয়েও যিনি জাগ্রত স্বরূপ তিনি হলেন, যিনি সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অর্জনের জন্যে অনুশীলন করে যাচ্ছেন। সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অর্জনে যার কোন আগ্রহ নেই, তিনি হলেন জাগ্রত হয়েও নিদ্রিত মানুষের মতো।"

অপর প্রশ্নটি হলো "একটি বড় হাতিকে কিভাবে ওজন করা যায় ?" উত্তরটি হলো, "হাতিটিকে একটি তরীতে উঠিয়ে তরীটি যতটুকু পানিতে ডুবে যায় ততটুকু জায়গায় দাগ দিয়ে, হাতিটিকে তরী থেকে অপসারণ করে পুনঃ পাথর ভর্তি করে যতক্ষণ পর্যন্ত তরীটি পূর্বের স্হান পর্যন্ত পানিতে ডুবে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত পাথর ভর্তি করে পরে ঐ পাথর ওজন দিয়ে হাতির ওজন নির্ণয় করা যায়।"

চতুর্থ প্রশ্নটি হলো, "একটি কাপ ভর্তি পানি কি সাগরের পানির চেয়ে বেশী ?" উত্তরটি হলো, "যদি কেহ তার পিতা-মাতাকে এক কাপ পানির মাধ্যমে পূত পবিত্র করে তুলতে পারে বা মৈত্রীময় ভাবধারায় নিয়ে যেতে পারে; অথবা অসুস্হ্য ব্যক্তিকে পরমার্থিক ভাবধারায় নিয়ে যেতে পারে, তাহলে সে পানির পরিমাণ কম হলেও সাগরের পানির চেয়ে বেশী। কারণ সাগরের জল একদিন শেষ হয়ে যাবে।"

পরে ঐ দেবতা একজন ক্ষুধার্ত মানুষ তৈরী করলেন; যার চামড়া এবং হাড় খুবই কম ছিল এবং অভিযোগের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ পৃথিবীতে আমার চেয়ে ক্ষুধার্ত আর কে আছে ?" উত্তরে বললেন, "যে ব্যক্তি বুদ্ধ, ধর্ম, এবং সংঘকে বিশ্বাস করে না; যে ব্যক্তি স্বার্থপর এবং লোভী; যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে এবং শিক্ষকদেরকে সম্মান প্রদর্শন করে না, ভরণ-পোষণ করে না; সে শুধু ক্ষুধার্তই হয় না, পিশাচের রাজ্যে পতিত হয়। পরিণামে সে সেখানে সারা জীবন ক্ষুধা যন্ত্রণায় কষ্ট ভোগ করে থাকে।"

পুনঃ দেবতা রাজাকে প্রশ্ন করলেন, "লম্বা এ চন্দন গাছের টুকরার কোন অংশটি গোড়ার অংশ ? উত্তরে বললেন, "গাছের টুকরাটি পানিতে ভাসিয়ে দিলে যে অংশটি পানিতে ডুবে যাবে সে অংশটি গাছের গোড়ার অংশ।"

শেষ প্রশ্নটি হলো "দু'টি ঘোড়া আকারের দিক থেকে দেখতে একই। কিভাবে এ দু'টি ঘোড়া থেকে মা এবং বাছুরকে বেছে নেবে ?" উত্তরে বললেন, "ঘোড়া দু'টোকে একসাথে খাবার দিলে মা খাবারগুলো বাছুরের দিকে ঠেলে দেয়।" এতে করে মা এবং বাছুর কোনটি তা সহজেই নির্ধারণ করা যায়।

উল্লেখিতভাবে দেবতা কর্তৃক রাজাকে যে প্রশ্নগুলো করা হলো তার সন্তোষ জনক প্রত্যুত্তর পেয়ে দেবতা সন্তুষ্ট হলেন। পরে রাজা জানতে পারলেন যে ঐ সব প্রশ্নের উত্তর এক বৃদ্ধ ব্যক্তি দ্বারা দেয়া হয়েছে। এতে রাজা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন; এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদেরকে অগম্য পাহাড়ে রাখার প্রথা তুলে দিয়ে তাদেরকে সেবা যত্ন করার পরামর্শ দিলেন।

২। একদিন ভারতের বিদেহ রাজ্যের রানী ৬টি শূঙ্গবিশিষ্ট একটি সাদা হস্তী স্বপ্নে দেখলেন। রানী ঐ শূঙ্গগুলো পাওয়ার আশা প্রকাশ করে, রাজাকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানালেন। যদিও একাজ সহজ নয়, তবুও রাজা যেহেতু রানীকে খুবই ভালোবাসতেন সেহেতু রাজ্যের মধ্যে এই বলে পুরস্কার ঘোষণা করলেন যে; যে বা যারা এরূপ হস্তী দর্শন করবে, সে বা তারা তা রাজাকে অবহিত করবে।

বিশুদ্ধিতা লাভের উপায়

হঠাৎ একদিন ৬টি শূঙ্গবিশিষ্ট হস্তী হিমালয় পর্বতে দেখা গেলো, যে হস্তীটি বুদ্ধত্বলাভের জন্যে ব্রত পালন করে আসছে। ঐ হস্তীটি একদিন গভীর অরণ্যে একজন শিকারীকে বিপদাপন্ন অবস্থায় প্রান রক্ষা করে ঐ শিকারীকে নিরাপদে নিজের বাসস্থানে ফিরে যেতে সহায়তা করেছিলো। কিন্তু ঐ শিকারী পুরস্কার লাভের আশায় মোহান্ধ হয়ে হস্তীটির করুণার কথা ভুলে গিয়ে পুনঃ তাকে হত্যা করতে অরণ্যে প্রবেশ করলো।

ঐ শিকারী বুঝতে পেরেছিল যে হস্তীটি বুদ্ধত্বলাভের জন্যে ব্রত পালন করছে। তবুও সে বৌদ্ধ ভিক্ষুর চীবর পরিধান করে নিজেকে গোপন রেখে হস্তীটি ধরার জন্যে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করলো।

হস্তীটি তার জীবনের পরিসমাপ্তি বুঝতে পেরে শিকারীর বৈষয়িক কামনা চরিতার্থ করার জন্যে তার নিকট উপস্থিত হয়ে করুণা বশতঃ তাকে নিজের শরীর দিয়ে ডেকে রেখে অন্যান্য হিংস্র হস্তীর আক্রমনের হাত থেকে রক্ষা করলো। অতঃপর হস্তীটি তাকে জিজ্ঞাসা করলো কেন সে এ নির্বুদ্ধিতার কাজটি করলো। শিকারী পুরস্কার লাভের কথা প্রকাশ করলো এবং হস্তীটির ৬টি শূঙ্গ পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। হস্তীটি এ কথা শুনার সাথে সাথে তার ৬টি শূঙ্গ গাছে আঘাত করে ভেংগে ফেললো এবং শিকারীকে নিতে বললো। পরে হস্তীটি তাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, "এ দানের মাধ্যমে আমি আমার বুদ্ধত্ব লাভের ব্রত পূরণ করলাম এবং আমি তুষিত দেবলোকে জন্ম নেবো। যখন আমি বুদ্ধ হয়ে এ পৃথিবীতে আসবো তখন তোমাকে তিন প্রকার বিষাক্ত তীর স্বরূপ লোভ, দ্বেষ, ও মোহ হতে রক্ষা করতে সাহায্য করবো।

৩। একদা হিমালয় পর্বতের পাদ দেশে ঘন অরণ্যের মধ্যে একটা তোতা পাখি অনেক পশু পক্ষির সাথে বাস করতো। হঠাৎ একদিন প্রচণ্ড বাতাসে বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণের মাধ্যমে ঐ ঘন অরন্যে অগ্নুৎপাত হলো এবং পশুপক্ষিরা ভয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছিল। তোতা পাখিটি তাদের শংকিত অবস্হা ও কষ্ট দেখে তাদের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ হলো এবং পশুপক্ষিগুলোকে তার নিজের নিরাপদ স্হানে নিয়ে গিয়ে সাধ্যমত সেবা শুশ্রুষা করতে লাগলো। তোতা পাখিটি পুকুরে ডুব দিয়ে পানি

সংগ্রহ করে ঐ পানি আগুনে নেভানোর কাজে ব্যবহার করলো। এভাবে তোতা পাখিটি পুনঃ পুনঃ তার করুণাপূর্ণ অনুভূতি নিয়ে ঘন অরণ্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা-পরায়ণ হয়ে আগুন নেভানোর কাজে নিয়োজিত হলো।

তোতা পাখিটির এ করুণাযুক্ত কাজ এবং আত্ন নিবেদিত অবস্হা দর্শন করে স্বর্গ থেকে দেবরাজ এসে পাখিটির সম্মুখে হাজির হয়ে তাকে বললেন, "তোমার মনে প্রচুর সাহস আছে। কিন্তু এ বিন্দু বিন্দু পানি নিক্ষেপ করে তুমি কি এ বিরাট আগুন নেভাতে সক্ষম হবে ?" তোতা পাখিটি বললো, "কৃতজ্ঞতাপূর্ণ মনোভাব এবং নিবেদিত প্রাণ হলে পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা অর্জন করা যায় না। আমি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে যাবো এমন কি পরবর্তী জীবনেও।" এতে দেবরাজ উৎসাহিত হলেন এবং এক সাথে পানি নিক্ষেপ করে আগুন নেভাতে সাহায্য করলেন।

৪। একদা হিমালয় পর্বতে এক দেহ ও দুই মাথাসম্পন্ন একটি পাখি বাস করতো। একদিন একটি মাথা দেখলো যে অন্য মাথাটি কিছু মিষ্টি ফল ভক্ষন করছে। এতে অন্য মাথাটি প্রতিহিংসাপরায়ণ হলো এবং বললো, "আমি বিষাক্ত ফল ভক্ষণ করবো।" পরে সে তাই করলো এবং সম্পূর্ন পাখিটিই বিষক্রিয়ায় মৃত্যু মুখে পতিত হলো।

৫। একদিন সাপের লেজ এবং মাথা ঝগড়া শুরু করলো যে, কোনটি তার সম্মুখের অংশ হবে। লেজের অংশটি মাথার অংশটিকে বললো, "তুমি সবসময় প্রথমে দৌঁড়াও, তোমার কখনো কখনো আমাকে সামনে যাওয়ার সুযোগ দেয়া উচিৎ। মাথা উত্তর দিলো, "ইহা আমাদের জন্যে স্বাভাবিক, যেহেতু আমি মাথা সেহেতু তোমার সাথে স্হান পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।"

কিন্তু তাদের এ ঝগড়া চলতেই থাকল এবং একদিন সাপের লেজ নিজেকে গাছের সাথে জড়িয়ে নিল এবং এভাবে মাথাকে এগিয়ে যাওয়া হতে প্রতিরোধ করতে চাইল। লেজের সাথে দ্বন্ধে যখন সাপের মাথা ক্লান্ত হয়ে গেল, তখন সে তার নিজস্ব পথ বেছে নিল। ফলশ্রুতিতে, পুরো সাপটিই মারা গেল।

বিশুদ্ধিতা লাভের উপায়

মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক নিয়মে সবসময় স্বাভাবিক নিয়ম অনুসৃত হয় এবং প্রতিটি বস্তুর নিজস্ব কার্যাবলী রয়েছে। যদি এ নিয়ম কোন কারণে বাধাগ্রস্ত হয়, তখন পুরো অবস্থাটাই পরিবর্তন হয়।

৬। সে সময়ে এক গ্রামে একজন মানুষ বাস করত, যে সহজেই রেগে যেতো। একদিন দু'জন লোক এক বাড়ির সামনে কথা বলছিল, যেখানে রাগী লোকটি বসবাস করতো। একজন অন্যজনকে বললো, "লোকটি খুবই ভালো কিন্তু বড় বেশী অস্থির, তার মাথা গরম এবং সহজেই রেগে যায়।" লোকটি তাদের মন্তব্য শুনলো এবং ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বের হয়ে আসলো। তারপর দু'জনকেই কিল ঘুষি দিয়ে আহত করলো।

যখন কোন জ্ঞানী লোক ঘোর অজ্ঞানী নহে এমন কারো ভুল ধরিয়ে দেয়, তখন তার বোধোদয় ঘটে এবং তার আচরণে উন্নতি ঘটে। কিন্তু যখন তার অসদাচরণে দেখা যায় যে, সে একই আচরণের কেবল পুনরাবৃত্তিই করছে না বরং একই ভুল পুনঃ পুনঃ করছে, তখন জ্ঞানীলোকের কর্তব্য হবে, এমন ঘোর অজ্ঞানীলোক থেকে সতর্কতার সাথে দূরত্ব বজায় রেখে চলা।

৭। কোন এক গ্রামে একজন ধনী, কিন্তু বোকা লোক বাস করতো। যখন সে যে কোন একজন লোকের সুন্দর বাড়ি দেখে তখনই পরশ্রীকাতর হয়ে অনুরূপ বাড়ি নিজে তৈরী করতো। কারণ সে মনে করতো যে, গ্রামে সেই একমাত্র ধনী লোক। সে রাজমিস্ত্রি ডাকলো এবং তাকে আদেশ দিল বাড়ী তৈরী করার জন্যে। রাজমিস্ত্রি একমত হলো এবং শীঘ্রই সে বাড়ীর ভিত দিতে লাগলো। এভাবে ১ম , ২য় এবং ৩য় তলা পর্যন্ত তৈরী করতে লাগলো। ধনী লোকটি রাগের সাথে তা লক্ষ্য করলো এবং বললো, "আমি ১ম ও ২য় তলা চাই না কেবল ৩য় তলাটাই চাই; তুমি তাড়াতাড়ি ওটাই তৈরী করো।"

একজন বোকা লোক ভালো ফলের জন্য কোনরূপ চেষ্টা ব্যতিরেকেই সবসময় ফলাফলের জন্য অধৈর্য্য হয়ে পড়ে। যথেষ্ট প্রচেষ্টা ছাড়া ভাল কিছুই অর্জন করা যায় না। অনুরূপভাবে, ১ম ও ২য় তলা তৈরী করার আগে ৩য় তলা তৈরী করা যায়

না।

৮। কোন এক গ্রামে একজন বোকা লোক মধু সিদ্ধ করছিল। তার এক বন্ধু সেখানে উপস্থিত হলো এবং বোকা লোকটি তাকে মধু পান করতে অনুরোধ করলো। কিন্তু মধুগুলো খুবই গরম ছিল। আগুন থেকে না সরিয়ে সে মধু ঠান্ডা করার জন্য পাখা করতে লাগলো। অনুরূপভাবে, জাগতিক নিয়মে আগুন থেকে না সরিয়ে ঠান্ডা মধু খাওয়ার চিন্তা করা বোকামির সামিল।

৯। এক স্থানে দু'টি দানব বসবাস করতো। তারা সারাদিন একটি বাক্স, বেত এবং একজোড়া জুতো নিয়ে বাক-বিতণ্ডা ও ঝগড়া করতো। একজন লোক যখন তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে জিজ্ঞাসা করলো কেন তারা এসব জিনিস নিয়ে ঝগড়া করছে ? এ জিনিসগুলোতে কি জাদুকরী শক্তি আছে যে, তারা এগুলো পাওয়ার জন্যে এত ঝগড়া করছে ?

দানবেরা তাকে বুঝালো এ বাক্স থেকে তারা খাবার, কাপড় বা ধনরাজি যে কোন কিছু পেতে পারে। যেমন, বেত দিয়ে তারা তাদের শত্রুকে শাস্তি দিতে পারবে; এবং জুতো দিয়ে তারা বাতাসে ভ্রমণ করতে পারবে।

তাদের এরূপ কথা শুনে লোকটি বললো, "কেন তোমরা ঝগড়া করছো ? যদি কয়েক মিনিট হাঁটো তবে এর চেয়ে আরো সুন্দর জিনিস তোমাদের হাতে আসবে।" একথা শুনে দুজন দানবই দৌড় দিল এবং তারা যাওয়া মাত্রই লোকটি জুতোজোড়া পড়ে নিল এবং বাক্স ও বেত ছিনিয়ে নিয়ে বাতাসে মিশে গেল।

এখানে দানবের মাধ্যমে অপবিশ্বাসকে বুঝানো হয়েছে। "বাক্সের" মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে দানের মাধ্যমে যে ফল পাওয়া যায় তাকে; তারা জানেনা দানের দ্বারা কি পরিমাণ ধনসম্পদ অর্জন করা যায়। "বেতের" মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে মনের একাগ্রতার অনুশীলনকে। মানুষেরা বুঝতে পারেনা যে মনের একাগ্রতা এবং দান অনুশীলনের মাধ্যমে তারা জাগতিক সমস্ত ভোগলালসা হতে মুক্তি লাভ করতে পারে। "জুতো জোড়ার" মাধ্যমে বুঝানো হচ্ছে পবিত্র নিয়মনীতিকে এবং সৎ

আচরণকে, যা তাদেরকে সমস্ত পার্থিব ভোগবিলাস ও বিতর্কের উর্দ্ধে নিয়ে যাবে। এগুলো না জেনে তারা বাক্স, বেত এবং জুতো জোড়া নিয়ে ঝগড়া করছে।

১০। এক সময়ে একজন লোক একা একা পরিভ্রমণে বের হয়েছিল। সন্ধ্যার সময়ে সে একটি খালি বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হলো এবং ঐ বাড়ীতে রাত্রি যাপন করতে মনস্থির করলো। মধ্যরাতের দিকে ঐ বাড়ীতে এক প্রেত একটি মৃতদেহ নিয়ে আসলো এবং ওটাকে নীচে রাখলো। পরপর অন্য এক প্রেত উপস্থিত হয়ে মৃতদেহটি তার বলে দাবী করলো এবং এ নিয়ে তারা ঝগড়া করতে লাগলো।

অতঃপর, প্রথম প্রেতটি বললো, "এই নিয়ে ঝগড়া করা অর্থহীন; চল আমরা এটা একজন বিচারকের নিকট পেশ করি।" অন্য প্রেতটি তার এই প্রস্তাবে রাজী হলো এবং ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ে থাকা লোকটিকে বললো মৃত দেহটির মালিকানা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্যে। লোকটি আরও ভীত হয়ে পড়লো, কারণ সে জানতো, সে যাই সিদ্ধান্ত দিক না কেন হেরে যাওয়া প্রেতটি এতে করে রাগান্বিত হবে এবং প্রতিশোধ নেবার জন্য হয়তো বা তাকে মেরেও ফেলতে পারে। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত করলো, সে যা দেখেছে তাই বলবে।

সে যা ভেবেছিলো তাই হলো। তার বিচারের রায় শুনে হেরে যাওয়া ২য় প্রেতটি রাগান্বিত হয়ে তার একটি বাহু ছিড়ে ভক্ষণ করতে লাগলো। এতে ১ম প্রেতটি মৃতদেহ হতে একটি বাহু ছিঁড়ে লোকটির বাহুর সাথে প্রতিস্থাপন করলো। ২য় প্রেতটি লোকটির ২য় বাহুও ছিড়ে ভক্ষন করতে লাগলো এতে ১ম প্রেতটি পুনঃ মৃতদেহ হতে ২য় বাহুটি ছিঁড়ে লোকটির শরীরে প্রতিস্থাপন করলো। এভাবে রাগান্বিত প্রেতটি ক্রমান্বয়ে লোকটির দুই পা, মাথা এবং পুরো শরীরটি ছিঁড়ে ভক্ষন করলো কিন্তু ১ম প্রেতটি শরীরের সব অংশগুলো পুনঃ সহসা মৃতদেহ হতে প্রতিস্থাপন করলো। এরপর প্রেত দু'টি দেখলো যে লোকটির শরীরের কিছু কিছু অংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে এবং তারা এগুলোকে তুলে নিয়ে গোগ্রাসে খেয়ে ফেললো। প্রেত দু'টি পরে ঐ স্থান ত্যাগ করলো।

দরিদ্র লোকটি যে ঐ ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল সে এই দুর্ভাগ্যের জন্য মনে খুবই দুঃখ অনুভব করছিল। তার শরীরের যে অংশগুলো প্রেতগুলো খেয়ে ফেলেছিল সে অংশগুলো ছিল তার পিতার এবং যে অংশগুলো এখন তার শরীরে আছে তা হলো মৃতদেহের। যাহোক, সে আসলে কে ছিল ? সমস্ত ঘটনা অনুধাবনের পরেও সে তা চিহ্নিত করতে পারছিল না এবং হতবুদ্ধিগ্রস্ত হয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্তে ঐ ঘর হতে বের হয়ে পড়লো। অবশেষে সে এক বিহারে এসে উপস্থিত হলো এবং তার সমস্ত দুর্দশার কথা বিহারে অবস্থানরত ভিক্ষুকে বললো। মানুষেরা নিজের অস্তিত্ববিহীন প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তার এই গল্প থেকে অনুধাবন করার চেষ্টা করতে পারে।

১১। একদা এক সুন্দরী ও সুবেশী মহিলা এক বাড়ীতে বেড়াতে গেল। গৃহকর্তা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, সে কে ? এতে মহিলাটি প্রত্যুত্তরে বললো, সে সম্পদের দেবী। গৃহকর্তা এতে খুবই খুশী হয়ে তাকে ভালভাবে আপ্যায়ন করলো।

কিছুক্ষণ পরে অন্য একজন মহিলা উপস্থিত হলো-সে দেখতে বিশ্রী এবং সুবেশী ছিল না। গৃহকর্তা তাকে জিজ্ঞাসা করলো সে কে ? মহিলাটি প্রত্যুত্তরে বললো, সে দরিদ্রের দেবী। গৃহকর্তা ভয় পেয়ে গেল এবং তাকে তাড়িয়ে দিতে চাইল। কিন্তু মহিলাটি চলে যেতে অস্বীকার করলো এবং বললো যে, "সম্পদের দেবী তার বোন। আমাদের মধ্যে অঙ্গীকার রয়েছে যে আমরা পরস্পর আলাদা হবো না। তুমি যদি আমাকে ঘর থেকে চলে যেতে বলো, তাহলে সেও আমার সাথে চলে যাবে।" সত্যি সত্যি বিশ্রী মহিলাটি ঘর ত্যাগ করার সাথে সাথে সম্পদের দেবীও ঘর ছেড়ে চলে গেল।

জন্মের সাথে মৃত্যুও জড়িত। তেমনি সৌভাগ্যের সাথে দুর্ভাগ্যও জড়িত। মন্দ কিছুকে ভালোও অনুসরণ করে। মানুষের তা বুঝা উচিৎ। বোকা লোকেরা দুর্ভাগ্যকে ভয় পায় এবং সৌভাগ্যের দিকে দৌঁড়ায়, কিন্তু যাঁরা বোধি জ্ঞান অর্জন করতে চায়, তাদের উভয়ের প্রতি সংস্কারমুক্ত, অনাসক্ত হওয়া উচিৎ এবং জাগতিক ভোগ-বিলাস যুক্ত আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া উচিৎ।

১২। একদা এক দরিদ্র শিল্পী তার ভাগ্য অন্বেষায় বাড়ী ও তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে

বিশুদ্ধিতা লাভের উপায়

বের হয়ে পড়েছিল। তিন বৎসর কঠোর পরিশ্রমের পরে সে ৩০০ স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চয় করলো এবং সিদ্ধান্ত নিল যে, সে বাড়ীতে ফিরে যাবে। পথিমধ্যে সে এক বড় বিহারের সামনে উপস্থিত হলো যেখানে দানের উদ্দেশ্যে বিশাল অনুষ্ঠান চলছিল। এটি দর্শন করে তার মন খুবই উৎসাহিত হলো এবং সে নিজে নিজে চিন্তা করলো, "এ পর্যন্ত আমি কেবলমাত্র আমার বর্তমান অবস্থা নিয়ে চিন্তা করেছি; আমি আমার ভবিষ্যৎ সুখের কথা ভাবিনি। আমার সৌভাগ্য যে আমি এই বিহারের সম্মুখে এসেছি, আমার অবশ্যই পুণ্যের বীজ বপনের সুযোগ নেয়া উচিৎ।" এরূপ চিন্তা করে উদার চিত্তে তার অর্জিত সব অর্থ সে দান করে দিয়েছিল এবং শূন্য হাতে বাড়ীতে ফিরে গিয়েছিল।

যখন সে বাড়ীতে পৌঁছাল তখন তার স্ত্রী তার প্রয়োজনে সামান্য পরিমাণ অর্থও সাথে না আনাতে তাকে তিরস্কার করতে লাগল। প্রত্যুত্তরে দরিদ্র শিল্পীটি বললো, আমি সামান্য পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছিলাম। কিন্তু ঐ অর্থ নিরাপদ স্হানে সঞ্চয় করে রেখেছি। যখন তার স্ত্রী টাকাগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তা জানার জন্যে জোড়াজুড়ি করছিল, তখন সে স্পষ্ট স্বীকার করেছিল যে, তা একটি বিহারের ভিক্ষুকে দান করে দিয়েছে।

এটা শুনে তার স্ত্রী তাকে গালাগালি করল এবং স্হানীয় বিচারকের কাছে বিচার দিল। যখন বিচারক শিল্পীকে তার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দেখাতে বলল, তখন সে বলল আমি বোকার মত কাজ করিনি; যেহেতু আমি দীর্ঘ এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করেছি সেহেতু ঐ অর্থগুলোকে আমি ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের জন্য দান করেছি। যখন আমি ঐ বিহারে পৌঁছেছিলাম তখন আমার মনে হয়েছিল, এখানে অর্থগুলো দান করলে ভবিষ্যতে সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া যাবে। সে আরও বললো, "আমি যখন বিহারের ভিক্ষুকে অর্থগুলো দান করছিলাম তখন মনে হয়েছিল আমি আমার মনের ভোগলালসা ও কৃপনতাভাব ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি এবং এটাও বুঝতে পেরেছিলাম যে সত্যিকার সম্পদ স্বর্ণালংকার নয়, তা হলো মন।"

বিচারক তার এ বোধোদয়ের প্রশংসা করল এবং যারা এ কাহিনী শুনল তারা সবাই নানাভাবে তাকে ধন্যবাদ জানালো। এভাবে শিল্পী এবং তার স্ত্রী চিরস্হায়ী

সৌভাগ্যের জগতে প্রবেশ করল।

১৩। শ্মশানের পাশে বসবাসকারী একজন লোক এক রাতে শ্মশান থেকে তাকে ডাকছে এমন শব্দ শুনতে পেল। সে এতই ভীতু যে নিজে এর তদন্ত করতে ভয় পেয়ে গেল। পরের দিন এই ব্যাপারে তার একজন সাহসী বন্ধুকে জানাল। লোকটি পরের দিন রাত্রে শব্দটি কোথা থেকে আসে তা খুঁজে দেখতে মনস্থির করল।

যখন ভীতু লোকটি ভয়ে কাঁপছিল, তখন তার বন্ধু শ্মশানে গেল, এবং নিশ্চিত হলো যে, ঐ শব্দ ঠিকই শ্মশান থেকে আসছে। ভীতু লোকটির বন্ধু জিজ্ঞাসা করলো, কে এই শব্দ করছে এবং সে কি চায় ? তখন মাটির নীচ থেকে একটি কন্ঠস্বর উত্তর দিল "আমি মাটির নীচে লুকায়িত সম্পদ বলছি; এই সম্পদ আমি কাকেও দিয়ে দিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তাই আমি গতরাত্রে একজনকে এই প্রস্তাব দিয়েছিলাম, কিন্তু সে এতই ভীতু যে সম্পদ গ্রহণ করতে আসেনি। তাই আমি তোমাকে এই সম্পদগুলো দেব, কারণ তুমিই ইহা পাওয়ার যোগ্য। আগামীকাল সকালে আমি আমার অন্য সাতজন অনুসারীকে সাথে নিয়ে তোমার বাড়ীতে যাব।"

সাহসী লোকটি বললো, "আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব ঠিক, কিন্তু দয়া করে আমাকে বলো আমি কিভাবে তোমাদের সেবা করব।" অলৌকিক কন্ঠস্বর উত্তরে বললো, "আমরা ভিক্ষু বেশে তোমার বাড়ীতে যাব, আমাদের জন্য পানি সহ একটি কক্ষ প্রস্তুত রাখবে; তোমার শরীর পরিস্কার করে ধৌত করার পরই তুমি ঐ কক্ষ পরিস্কার করবে। আমাদের জন্য বসার আসন তৈরী করবে এবং ৮ বাটি চালের তৈরী জাউ রান্না করবে। আহারের পরে, তুমি আমাদেরকে একজন একজন করে বদ্ধ এক ঘরে নিয়ে যাবে, যেখানে আমরা স্বর্ণের কলসিতে পরিণত হবো।"

পরদিন লোকটিকে যেভাবে বলা হয়েছিলো ঠিক সেভাবে সে তার শরীর ধৌত করে কক্ষ পরিস্কার করলো এবং ৮ জন ভিক্ষু আসার প্রতীক্ষায় রইল। ঠিক সময়ে তারা উপস্থিত হলো এবং সে তাদেরকে বরণ করে নিল। আহার গ্রহণের পর সে এক এক জন করে তাদেরকে একটি বদ্ধ ঘরে নিয়ে গেল, যেখানে তারা স্বর্ণ ভর্তি

কলসিতে রূপান্তরিত হলো।

একই গ্রামে ছিল এক অতীব লোভী ব্যক্তি সে এ ঘটনার কথা শুনলো এবং স্বর্ণের কলসিগুলো পেতে চাইল। সেও একইভাবে ৮ জন ভিক্ষুকে তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ জানালো। আহারের পরে সে তাদেরকে একটি বদ্ধ ঘরে নিয়ে গেল। কিন্তু তারা স্বর্ণের কলসিতে পরিণত না হয়ে রাগান্বিত হলো এবং লোভী লোকটিকে পুলিশে হস্তান্তর করলো।

ভীতু লোকটি যখন শুনলো যে শ্মশান থেকে ভেসে আসা কন্ঠস্বর তার সাহসী বন্ধুকে ধনী ব্যক্তিতে পরিণত করেছে, তখন সে লোভের বশবর্তী হয়ে তার বন্ধুটির বাড়ীতে ছুটে গেল এবং স্বর্ণের কলসিগুলোর মালিকানা দাবী করলো। সে বলে উঠলো যে এই কন্ঠস্বর আমিই প্রথমে শুনেছি, তাই এই স্বর্ণের কলসির মালিক আমি। ভীতু লোকটি যখন স্বর্ণের কলসিগুলো নিয়ে যেতে চাইলো তখন সে কলসিগুলোর ভিতরে অনেক সাপ দেখতে পেলো যেগুলো ফণা তুলে আছে তাকে কামড়ানোর জন্য।

রাজা উক্ত ঘটনাটি শুনলেন এবং আদেশ জারী করলেন যে স্বর্ণের কলসিগুলোর মালিক সাহসী লোকটিই। তিনি আরও বললেন, "এই পৃথিবীতে সবকিছুই এভাবে ঘটে। বোকা লোকেরা কেবল ভাল ফলের জন্য লালায়িত হয়ে থাকে; ভীতুরা এর পিছনে ছুটে এবং এতে তারা ক্রমাগতভাবে ব্যর্থ হয়। তাদের মাঝে মনের আভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলা করার বিশ্বাসও নেই, আবার সাহসও নেই যার মাধ্যমে সত্যিকারের মানসিক শান্তি এবং স্হিরতা অর্জন করা যায়।"

২য় পরিচ্ছেদ

সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

১

সত্যের সন্ধানে

১। সত্যের সন্ধানে কতিপয় প্রশ্নের অবতারণা করা হয়, যা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন, কি বস্তু দিয়ে এই বিশ্ব গঠিত ? এই বিশ্ব কি চিরন্তন ? এই বিশ্বের সীমারেখা আছে কি নাই ? কিভাবে এই মানব সমাজ একত্রিত হয়েছে ? মানব সমাজের জন্য আদর্শ সাংগঠনিক কাঠামো কি ? যদি কোন ব্যক্তি এই সকল প্রশ্নের সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত, জ্ঞানের সন্ধান বা জ্ঞান অর্জনের চর্চা বন্ধ রাখে, সে জ্ঞান অর্জনের পথ খুঁজে পাওয়ার পূর্বেই মারা যাবে।

মনে করুন, একজন লোক বিষাক্ত তীর দ্বারা আক্রান্ত হলো। এতে তার আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুরা ডাক্তারের কাছে গেলো তীরটি বের করার জন্য এবং ক্ষত স্হানটি ভালো করার জন্য।

যদি আহত লোকটি এ বলে বাঁধা দেয় যে, "কিছুক্ষন অপেক্ষা করো, তীরটি বের করার পূর্বে আমি জানতে চাই, কে ইহা নিক্ষেপ করেছে ? সে কি মহিলা, না পুরুষ ? সে কি উচ্চ বর্ণের লোক, নাকি কৃষক ? তীর ছোড়ার যন্ত্রটি কিসের তৈরী ? ইহা কি বড়, না ছোট ? ইহা কি কাঠের, নাকি বাঁশের তৈরী ? ধনুকটি কি দিয়ে তৈরী ছিলো ? ইহা কি আঁশ দিয়ে তৈরী, নাকি তার দিয়ে তৈরী ? তীরটি কি লাঠি, না ধাতব পাত দিয়ে তৈরী ? ঐ তীরে কি ধরনের পালক ব্যবহার করা হয়েছে ? তোমরা তীরটি বের করার পূর্বে আমি এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই।" তারপর যা হওয়ার হবে।

এ সকল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পূর্বেই সন্দেহ নেই, বিষ লোকটির শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং লোকটি মারাও যেতে পারে। প্রথম কর্তব্য হলো তীরটি বের

করা এবং বিষ ছড়ানো প্রতিরোধ করা।

যেখানে একটি আগুনের ফুলকি এই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে সেখানে এই বিশ্ব সৃষ্টির উপাদান খোঁজা বা মানবিক সমাজ গঠনের আদর্শ উপাদান খোঁজা নিরর্থক।

এ পৃথিবীর সীমারেখা আছে কি নাই, এই পৃথিবী চিরন্তন কিনা এই প্রশ্নের উত্তর জানার চেয়ে জন্ম, বার্ধক্য, জ্বরা এবং মৃত্যু সম্পর্কে জানা জরুরী। দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা, ভোগান্তি এবং মনোকষ্টের উপস্থিতিতে, আমাদের আগে তা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে বের করা এবং এর চর্চায় নিজেকে নিবেদিত করা উচিৎ।

বুদ্ধের শিক্ষা ইহাই ধারণ করে, যা জানা প্রয়োজন তা জানতে হবে, আর যা জানার প্রয়োজন নেই তা ত্যাগ করতে হবে। ইহার অর্থ এই যে, যা শিক্ষা করা দরকার তা অবশ্যই শিক্ষা করতে হবে এবং যা বর্জন করা দরকার তা অবশ্যই বর্জন করতে হবে। যা চর্চার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন সম্ভব তা শিক্ষা করা উচিৎ।

অতএব, মানুষের প্রথমে উপলব্ধি করা উচিৎ, কোন কাজটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ; কোন সমস্যাটি প্রথমে সমাধান করতে হবে এবং এ জন্য কোথায় বেশী জোর দিতে হবে। এ সকল কাজ করতে গেলে প্রথমে তাদের মনকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এর অর্থ হলো মনকে সংযমতার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

২। ধরি, একজন লোক বনে গেল গাছের আঁশ সংগ্রহ করতে, কিন্তু সে একবোঝা গাছের শাখা-প্রশাখা এবং পাতা নিয়ে ফিরে এলো। সে মনে করছে, যে জন্য সে বনে গিয়েছিল তার সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। সে কি বোকা নয় ? যদি সে গাছের ছাল বা গাছ এনে সন্তুষ্ট হয়, তাহলে কেন সে গাছের আঁশ সংগ্রহ করতে গেল ? কিন্তু এটাই সত্যি এবং সাধারণত মানুষেরা তাই করে থাকে।

একজন লোক এমন পথ অনুসন্ধান করে, যা তাকে জন্ম, বৃদ্ধ অবস্হা, বার্ধক্য এবং মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে; অথবা ভোগান্তি, দুঃখ, মনোকষ্ট থেকে

মুক্তি লাভ করতে পারে। কিন্তু মানুষ কিছুদূর চলার পর যখন সে সামান্য উত্তরণ লাভ করে, এর পরপরই সে গর্বিত ও উদ্ধত হয় এবং দাম্ভিকতা প্রকাশ করে। আসলে, সে উপরে উল্লেখিত লোকটির মতোই গাছের সন্ধানে গিয়ে একবোঝা গাছের শাখা প্রশাখা ও পাতা নিয়েই সন্তুষ্ট হয়।

অন্য একজন লোক সামান্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে যা অর্জন করে, তা নিয়েই সন্তুষ্ট হয় এবং কর্মে শিথিলতা অনুভব করে, গর্ব এবং অহংকার প্রকাশ করে। এর অর্থ হলো, গাছের মধ্যেকার আঁশের সন্ধানের পরিবর্তে এক বোঝা গাছের শাখা প্রশাখা নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া।

আবার অন্য এক ধরনের লোক আছে, তারা ভাবে যে তার মন শান্ত হয়ে আসছে, তার চিন্তা-ধারা ক্রমান্বয়ে স্বচ্ছ হয়ে আসছে। তখন তার প্রচেষ্টায় শিথিলতাভাব দেখা যায় এবং গর্ব ও অভিমান করে। ঐ ব্যক্তিও গাছের আঁশ সন্ধানের পরিবর্তে ছাল নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার মতোই।

পুনরায় অন্য এক ধরনের মানুষ আছে, তারা জ্ঞানের গভীরতার জন্য অহংকার করে। তারাও গাছের আঁশ লাভ না করে, একবোঝা সরু গাছ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। এসকল অনুসন্ধানী যারা সামান্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে সহজেই সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, তারা গর্ব ও আত্নম্ভরিতা অনুভব করে। অতঃপর দেখা যায়, তাদের চেষ্টার মধ্যে শিথিলতা দেখা দিচ্ছে এবং সহজেই অলস হয়ে পড়ছে। ফলে নিশ্চিতভাবে তারা পুনরায় ভোগান্তির মুখোমুখি হয়।

যারা সঠিক জ্ঞানের অনুসন্ধানী কোনভাবেই তাদের মনে সম্মান, মর্যাদা বা অনুরক্তি প্রত্যাশা করা উচিৎ নয়। তদুপরি, প্রশান্তি, জ্ঞান বা জ্ঞানের গভীরতা অর্জনের পথে নূনতম প্রচেষ্টা কখনো তাদের লক্ষ্য হতে পারে না।

সর্বপ্রথমে, একজন মানুষের মনে এই বিশ্বে বিরাজমান জন্ম ও মৃত্যুর মৌলিক ও প্রকৃত স্বরূপটা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ধারণা থাকা উচিৎ।

সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

৩। এই মহাবিশ্বের নিজস্ব কোন উপাদান নেই। ইহা হলো বিপুল পরিমাণ সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্য-কারণ সম্পর্কের মিলন মাত্র; যাদের মৌলিক, একক এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমাদের মনের কার্যাবলীতে যা অজ্ঞতা, মিথ্যা ধারণা, আকাংখা এবং মোহ হিসেবে প্রকাশিত হয়। মনে সর্বদা যে মিথ্যা ধারণারাশির সৃষ্টি হয়, তার কোন বাহ্যিক কাঠামো বা উপাদানের অস্তিত্ব নেই। ইহা মনের নিজস্ব প্রক্রিয়া, যা সেই মোহের প্রকাশ ভঙ্গির মাধ্যমে উন্মোচিত হয়। ইহা মনের আকাংখা, ভোগান্তির পরিণাম, নিজস্ব লালসা, রাগ এবং বোকামির দ্বারা যে কষ্ট মর্মবেদনা সৃষ্টি হয়, তা তার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। যাঁরা জ্ঞান অর্জনে প্রত্যাশী তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছা পর্যন্ত এসকল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

৪। "হে আমার মন ! কেন তুমি আমাকে জীবনের এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এত অবিশ্রান্তভাবে দোদুল্যমান রেখেছো ? কেন তুমি আমাকে এত দ্বিধাগ্রস্ত এবং অস্থির রাখো ? কেন তুমি আমাকে এত বস্তু সংগ্রহে প্ররোচিত করো ? তুমি যেন লাঙ্গলের মত, যা চাষাবাদের পূর্বে মাটিকে টুকরা টুকরা করে আবাদের অবস্থায় পরিণত করে। তুমি জীবন ও মৃত্যু স্বরূপ সমুদ্রে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় মইয়ের ন্যায় সবকিছুকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দাও। আমাদের এত পুনঃজন্মের প্রয়োজন কি, যদি না আমরা আমাদের বর্তমান জীবনেরই সদ্ব্যবহার করতে না পারি ?"

"হে আমার মন ! একবার তুমি আমাকে রাজা হিসেবে জন্মগ্রহণ করিয়েছো; পরে আবার দীন-দরিদ্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করিয়ে দ্বারে দ্বারে খাবারের জন্য ভিক্ষা করিয়েছো। কখনও কখনও তুমি আমাকে নিয়ে যাও স্বর্গের সুরম্য অট্টালিকায় এবং বিলাস বহুল ও পরমানন্দে জীবন কাটাতে; আবার সেই তুমিই আমাকে বাধ্য করো নরকের অগ্নি শিখায় দগ্ধ হতে।"

"হে আমার নির্বোধ মন ! এভাবে তুমি আমাকে বাধ্য করো বিভিন্ন পথে হাঁটতে এবং তোমার প্রতি বাধ্য ও অনুগত হতে। কিন্তু আমি এখন বুদ্ধের শিক্ষা সম্পর্কে জেনেছি, আমাকে আর বিরক্ত করো না এবং পুনরায় কষ্টে ফেলো না। বরং চলো আমরা একত্রে বিনম্র ও সুস্থির চিত্তে জ্ঞানের অনুসন্ধানে ব্রতী হই।"

"হে আমার মন ! যদি কেবল মাত্র তুমি জান যে পৃথিবীর প্রতিটি জিনিষই অস্হিত্ববিহীন, ক্ষণস্হায়ী; তখন বস্তুর পিছনে লালায়িত হওয়া; পর সম্পত্তি কামনা করা; এবং লোভ, দ্বেষ ও মোহের পেছনে তাড়িত হওয়া উচিৎ নয়। তাহলেই আমরা শান্তির পথে যাত্রা করতে পারি। তারপর আমাদের রিপুগুলোকে বিজ্ঞতার তলোয়ার দ্বারা কেটে কেটে, পরিবর্তিত পরিস্হিতিতে স্হির অবস্হায় থেকে, সুবিধা বা অসুবিধা, ভাল বা মন্দ, লাভ বা অলাভ, প্রশংসা বা নিন্দা দ্বারা প্রভাবিত না হলে, আমরা শান্তিতে বাস করতে পারি।"

"হে আমার প্রিয় মন ! তুমিই প্রথম আমার মনে বিশ্বাস জাগ্রত করিয়েছো; তুমিই সে, যে আমাকে জ্ঞান অন্বেষণের পথ খোঁজার উপদেশ দিয়েছো। কেন তুমি আবার এত সহজে লোভী হতে, আরামকে ভালবাসতে এবং আবেগের দ্বারা আন্দোলিত হতে বাধ্য করো ?"

"হে আমার মন ! কেন তুমি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াও ? চলো আমরা মোহের হিংস্র সমুদ্র পেরিয়ে যাই। এযাবত আমি তোমার ইচ্ছানুসারে কাজ করে আসছি, কিন্তু এখন তোমাকে আমার ইচ্ছামত কাজ করতে হবে; এবং একত্রে আমরা বুদ্ধের শিক্ষাকে অনুসরণ করবো।"

"হে আমার প্রিয় মন ! এই পর্বতমালা, নদী, নালা এবং সাগর সমূহ পরিবর্তনশীল এবং বেদনা উৎপাদক। এই মোহপূর্ণ পৃথিবীতে কিভাবে আমরা শান্তি প্রত্যাশা করতে পারি ? চলো আমরা বুদ্ধের শিক্ষাকে অনুসরণ করি এবং জ্ঞানের অন্য স্তরে গমন করি।"

৫। যারা সত্যিকার জ্ঞানের প্রত্যাশী তারা তাদের মনকে এভাবেই কোমল ও কঠোরভাবে এই পথে নিবেদিত করবে। তারপরেই তারা কঠিন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে। এমনকি যদি তারা কারো দ্বারা নিন্দিত বা অপমানিতও হয়, তখনো তারা নির্বিকারে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে। যদি তাদের লাঠি দিয়ে মারা হয়, পাথর দিয়ে আঘাত করা হয়, বা তলোয়ার দিয়ে খোঁচানোও হয়, তবুও তারা রাগান্বিত হয় না।

সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

এমনকি শত্রু যদি শরীর থেকে তাদের মাথা ছিন্নও করে ফেলে, তখনো তাদের মন স্বাভাবিক থাকে। তারা যে কষ্ট ভোগ করছে, তার দ্বারা যদি তাদের মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তাহলে তারা বুদ্ধের শিক্ষা গ্রহণ করছে না। তাদের এমনভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে যে, তাদের প্রতি যাই ঘটুক না কেন নিজেদেরকে হতে হবে অবিচলিত, অনঢ়, চিরপ্রদীপ্ত চিন্তাধারা, করুণাময় এবং সহযোগিতামূলক। যতই বঞ্চনা আসুক, যতই দুর্ভাগ্য জড়িয়ে ধরুক, একজন মানুষ যদি অবিচলিত থাকে এবং মনকে শান্ত রাখতে পারে, তাহলে বুঝতে হবে যে বুদ্ধের শিক্ষা তার ব্যবহারিক কাজে এসেছে।

আমাদেরকে প্রকৃত বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জন করতে হবে, অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে, অজেয়কে জয় করতে হবে। আমাদেরকে নিজেদের সর্বশেষ শক্তি দিয়ে তা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। যদি কাকেও বলা হয় যে বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জনের জন্য দিনে মাত্র ভাতের একটি দানা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে, তাই তাকে করতে হবে। যদি বুদ্ধত্বজ্ঞান অর্জনের জন্য তাকে আগুনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়, তাকে তাই করতে হবে।

কিন্তু অভিসন্ধিমূলকভাবে কোন কিছু করা উচিৎ নয়। বিজ্ঞতা এবং উদারতার সাথে সঠিক কাজ করা উচিৎ। মা যেমন নিজের পুত্রকে স্নেহপরবশ হয়ে আদর যত্ন করে, অসুস্থ্যতার সময়ে সেবা শুশ্রুষা করে, যা তার নিজের আরাম আয়েশের জন্য করে না।

৬। একদা একদেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিজের রাজ্যের জনগণকে এবং রাজ্যকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি বিজ্ঞতা ও দয়ার দ্বারা দেশ শাসন করতেন, যার ফলে তাঁর দেশ উন্নতি লাভ করছিল এবং প্রজাগণ শান্তিতে বাস করছিল। তিনি সর্বদা উচ্চতর প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের অনুসন্ধানী ছিলেন। যিনি তাঁকে মূল্যবান শিক্ষা সম্পর্কে পথনির্দেশনা দিতেন, তিনি তাকে পুরস্কৃত করতেন।

তাঁর এই ধার্মিকতা এবং বিজ্ঞতা দেবতাদের দৃষ্টি আকর্ষন করলো। কিন্তু তাঁরা তাঁকে পরীক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। একদিন এক দেবতা দানব বেশে

রাজপ্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হলেন এবং দ্বাররক্ষীদেরকে বললেন তাঁকে রাজার কাছে নিয়ে যেতে; যেহেতু তিনি রাজার জন্য পবিত্র শিক্ষা নিয়ে এসেছেন।

যথা সময়ে রাজার কাছে ঐ খবর পৌঁছানো হলো। এতে রাজা খুবই খুশী হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে এবং আন্তরিকভাবে তাকে স্বাগত জানালেন এবং তার নির্দেশনা প্রার্থনা করলেন। হঠাৎ দানবটি রুদ্রবেশ ধারণ করল এবং খাবার দাবী করল এই বলে যে, সে তার চাহিদামতো খাবার না পেলে শিক্ষাদান করবে না। অতঃপর তাকে তার পছন্দমতো খাবার প্রদান করা হলো। কিন্তু সে জোড়াজুড়ি করতে লাগলো এই বলে যে, তাকে অবশ্যই মানুষের উষ্ণ মাংস এবং রক্ত দিতে হবে ভক্ষনের জন্যে। এতে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যুবরাজ তার শরীর দান করলেন এবং রানীও তার শরীর দান করলেন। কিন্তু তবুও দানবটি অসন্তুষ্টই রয়ে গেল এবং রাজার শরীর ভক্ষনের দাবী করতে লাগল।

রাজা তাঁর শরীর দান করতে সদিচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তিনি দাবী করলেন যে তাঁর শরীর দান করার পূর্বে শিক্ষাটি শ্রবণ করতে চান।

এতে দানবটি নিম্নোক্ত জ্ঞানগর্ভ শিক্ষাটি বর্ণনা করলো, "তৃষ্ণা থেকে দুঃখ ও ভয় উৎপন্ন হয়; যার তৃষ্ণা নাই তার দুঃখও নাই, ভয়ও নাই।" এরপর হঠাৎ করে দানবটি তার আসলরূপে আবির্ভূত হলেন। যুবরাজ এবং রানীও তাদের পূর্বের অবস্থায় রাজার সন্মুখে আবির্ভূত হলেন।

৭। একদা কোন এক গ্রামে একব্যক্তি ছিলেন, যিনি হিমালয় পর্বতে সত্যিকার পথের অনুসন্ধানে বেরিয়েছিলেন। তিনি বৈষয়িক ও স্বর্গীয় কোন সম্পদই কামনা করেন না; কিন্তু ঐ শিক্ষাই তিনি অনুসন্ধান করেন, যার দ্বারা নিজের মনের সকল প্রকার মোহ হতে মুক্তি লাভ করা যায়।

এক দেবতা লোকটির আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততায় সন্তুষ্ট হয়েছিল এবং তাঁর মনকে পরীক্ষা করতে চাইলো। তাই দেবতাটি ছদ্মবেশে হিমালয় পর্বতের ধারে তাঁর সামনে উপস্থিত হলো এবং গানের সুরে বলতে লাগলো, "এই পৃথিবীর সবকিছুই অনিত্য,

সব কিছুই উৎপন্ন হয় এবং আবার বিলীন হয়।"

সত্যানুসন্ধানী উক্ত গানের কথাগুলো শুনলেন যা তাঁকে খুবই সন্তুষ্ট করল। তিনি এতই আনন্দিত হলেন যে যাতে তাঁর মনে হলো তিনি পিপাসা নিবারণের জন্য শীতল পানির ঝর্ণা খুঁজে পেলেন; বা তাঁর মনে হলো যে, একজন বন্দী অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তি পেল। তিনি নিজেকে নিজে বললেন "অবশেষে আমি সত্যিকার শিক্ষার সন্ধান পেয়েছি; যা আমি দীর্ঘদিন ধরে খুঁজছিলাম।" তিনি কণ্ঠস্বরটি অনুসরণ করলেন এবং ভয়ঙ্কর দেবতাটির সামনে উপস্থিত হলেন। অসতর্ক মনে তিনি দেবতাটিকে আবেদন জানিয়ে বললেন, "তুমি কি সেই, যে গানটি গেয়েছিলে যা আমি এই মুহূর্তে শুনলাম।" যদি তুমি তাই হও, তাহলে পুরো গানটি গেয়ে শেষ করো।

দেবতাটি উত্তর দিল, "হ্যাঁ, ইহা আমার গান; কিন্তু আমি এর বেশী গাইতে পারবো না, যদি আমি কিছু খেতে না পাই। কারণ আমি ক্ষুধার্ত।"

লোকটি গানটির অবশিষ্টাংশ শোনার জন্য এ বলে প্রার্থনা জানালেন যে, "আমার কাছে এর গভীর অর্থ রয়েছে এবং আমি দীর্ঘকাল যাবৎ এই শিক্ষার পেছনে ছুটছি। আমি কেবল এর কিছু অংশ শুনেছি, দয়া করে আমাকে অবশিষ্টাংশটি শোনাও।"

লোকটি শিক্ষার বাণী শোনার আগ্রহে দেবতার কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন, শিক্ষার বাণীগুলো শোনার পর স্বেচ্ছায় তিনি তাঁর শরীর দান করে দেবেন। এরপর দেবতাটি পুরো গানটি শেষ করলো। গানটির কথাগুলো হলো নিম্নরূপ ঃ

এ জগতে প্রত্যেক কিছুই পরিবর্তনশীল,
সবকিছুই উৎপন্ন হয় এবং আবার বিলুপ্ত হয়;
প্রকৃত শান্তি তখনই আসে,
যখন কেউ জন্ম ও মৃত্যুকে অতিক্রম করে।

গানটি শোনার পর লোকটি তাঁর চতুর্দিকের পাথর ও গাছের মধ্যে কবিতা

লিখলো। পরে শান্তভাবে গাছে উঠে বসলেন এবং স্বজোরে নিজেকে দেবতার পায়ের কাছে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু হঠাৎ দেবতাটি সেখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেল এবং এর পরিবর্তে একজন দীপ্তিমান দেবতা লোকটির অক্ষত দেহ গ্রহণ করলো।

৮। কোন এক সময়ে সাদাপ্রারুদিতা নামে সত্য পথ অন্বেষণকারী এক লোক ছিলো। সে একদিকে সব ধরনের লাভ বা সম্মানের প্রতি প্রলুব্ধ ছিলো এবং অন্যদিকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সত্যের অনুসন্ধানে ব্রত ছিল। একদিন স্বর্গ থেকে সে আওয়াজ শুনতে পেলো, "সাদাপ্রারুদিতা ! তুমি সোজা পূর্ব দিকে চলে যাও, ঠান্ডা বা গরমের কথা চিন্তা করবে না; বৈষয়িক কোন প্রশংসা বা ঘৃণার প্রতি মনোযোগ দেবে না; ভাল বা মন্দের পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি দেবে না; কেবল পূর্ব দিকে যেতে থাক। সুদূর পূর্বে গেলে তুমি এক সত্যিকার শিক্ষক খুঁজে পাবে এবং জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে।"

সাদাপ্রারুদিতা সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা পেয়ে সন্তুষ্ট হলো এবং অতি তাড়াতাড়ি পূর্বদিকে যাত্রা শুরু করলো। মাঝে মাঝে যখন রাত্রি নেমে আসতো তখন সে বিশ্রাম নিত এবং নিজেকে খোলা মাঠ বা গভীর পর্বতের মাঝে আবিস্কার করতো।

বিদেশের মাটিতে আগন্তুক হয়ে আসার পর সে অনেক অবমাননা বোধ করেছিল। একবার সে নিজেকে দাস হিসেবে বিক্রী করে দিয়েছিল; ক্ষুধার জ্বালায় সে নিজের শরীরের মাংস বিক্রী করে দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সত্যিকার শিক্ষকের খোঁজ পেল এবং তার কাছে দিকনির্দেশনা প্রার্থনা করলো।

প্রবাদ আছে, "ভাল কিছুর জন্য সবসময় মূল্য দিতে হয়" এবং সাদাপ্রারুদিতা তার বেলায়ও এর সত্যতা খুঁজে পেল। সত্যানুসন্ধানের এই পরিক্রমায় সে নানাবিধ জটিলতা ভোগ করেছিল। তার কাছে এমন কোন অর্থও ছিল না, যা দিয়ে সে শিক্ষককে দেয়ার জন্য ফুল বা ধূপ কিনবে। সে এজন্য চাকরী করতে চাইলো কিন্তু কেউ তাকে চাকুরীতেও নিলনা। তার মনে হচ্ছিল যে, সে যেদিকে যাচ্ছিল খারাপ

একটি শক্তি তার পথকে কণ্টকাকীর্ণ করছিল। জ্ঞানের সন্ধান লাভ করা খুবই কঠিন এবং এর জন্য নিজের জীবনকে মূল্য হিসেবে দিতে হতে পারে।

অবশেষে, সাদাপ্রারুদিতা তার শিক্ষকের সামনে উপস্থিত হলো এবং এরপর সে নতুন জটিলতায় উপনীত হলো। তার নিকট কাগজ ছিল না লিখার জন্য; কালি ছিলনা যার দ্বারা সে লিখবে। তাই পরে সে ছুরি দিয়ে নিজের হাতের কব্জি কেটে রক্তের মাধ্যমে লিখা শুরু করলো। এভাবে সে মূল্যবান শিক্ষা অর্জন করলো।

৯। এক সময়ে কোন এক গ্রামে সুধানা নামে এক বালক ছিল; যে জ্ঞানানুসন্ধানে নিবেদিত ছিল। জেলের কাছ থেকে সে সমুদ্রবিদ্যা শিখল। ডাক্তারের কাছ থেকে রোগীদের কষ্টের সময়ে সমব্যথিত হতে শিক্ষা লাভ করলো। ধনীর কাছে সে শিক্ষা নিল যে, অর্থ সঞ্চয়ই তার জীবনে সৌভাগ্যের চাবিকাঠি এবং অর্জিত সবকিছুই জীবনে জ্ঞান লাভে কত যে প্রয়োজন তা চিন্তা করলো।

একজন ধ্যানী ভিক্ষুর কাছ থেকে সে শিক্ষা করলো যে পবিত্র ও শান্ত মনে জাদুকরী ক্ষমতা লুকায়িত রয়েছে যা অন্যের মনকেও পবিত্র ও শান্ত করতে পারে। তারপর, সে একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলার সাথে দেখা করল এবং সে তার পরহিতমূলক কাজে উৎসাহিত হলো। ঐ মহিলার কাছ থেকে সে শিক্ষা লাভ করল যে, পরহিতমূলক কাজ বিজ্ঞতারই ফসল। এরপরে সে একজন বৃদ্ধ আগন্তুকের দর্শন পেলো। আগন্তুকটির কাছে সে শিক্ষা লাভ করল যে, কোন এক লক্ষ্যবস্তুতে উপনীত হতে হলে তরবারীর ন্যায় তীক্ষ্ণ পর্বত এবং আগুনের উপত্যকার ভিতর দিয়েও অতিক্রম করতে হয়। অবশেষে সুধানা নিজের এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করল যে, সে যা কিছু দেখেছে এবং শুনেছে সেগুলোর মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব।

সে গরীব এক পঙ্গু মহিলার কাছ থেকে ধৈর্য্য সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করল; রাস্তায় খেলাধুলা করছিল এমন শিশুদের কাছ থেকে সে শিখেছিল সহজ-সরল জীবন যাত্রা; কিছু ভদ্র ও মার্জিত ব্যক্তি যারা অন্যান্য দশজন লোকের ন্যায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই প্রত্যাশা করে না তাদের কাছ থেকে সে এই পৃথিবীতে শান্তিপুর্ণ

জীবন যাপনের পবিত্র শিক্ষা লাভ করলো।

সে ধূপের উপাদানগুলোর ঘূর্নায়নের দৃশ্য দেখে বৈরিতামুক্তির শিক্ষা লাভ করেছিল; ফুলের সুবিন্যস্ততার দৃষ্টান্ত অনুকরণের মাধ্যমে সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের শিক্ষা নিয়েছিল। একদিন সে বনের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় পরিশ্রান্ত হয়ে বিশাল এক গাছের নীচে বিশ্রাম নিচ্ছিল এবং লক্ষ্য করল যে, পতিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত এক গাছের পাশে একটি ক্ষুদ্র চারাগাছ জন্মাচ্ছে; ইহা তাকে জীবনের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিল।

দিনে সূর্যালোক এবং রাতে তারার অবিরাম ঝিকমিক আলো তার চিন্তাধারাকে শানিত করছিল। এভাবে সুধানা তার সুদীর্ঘ পরিভ্রমণে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল।

অতএব, আসলে যারা প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী তাদের নিজ নিজ মনকে দূর্গ হিসেবে ভাবতে হবে এবং একে উত্তমরূপে সজ্জিত করতে হবে। তাদের অবশ্যই মনোদ্বারকে বুদ্ধের জন্য বিস্তৃতাকারে খুলে দিতে হবে এবং শ্রদ্ধা ও নম্রতার মাধ্যমে তাঁকে অন্তরের অন্তঃস্হলে আমন্ত্রণ জানাতে হবে; এবং সেখানে তাঁকে শ্রদ্ধারূপ সুগন্ধী এবং কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ স্বরূপ ফুলের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানাতে হবে।

২
অনুশীলনের বিভিন্ন উপায়

১। যারা জ্ঞানের অনুসন্ধানী তাদের জন্য তিনটি অনুশীলনের পথ রয়েছে যা তাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে। প্রথমটি হলো, ব্যবহারিক আচরণে শৃঙ্খলা; দ্বিতীয়টি হলো, মনের সঠিক স্হিতিশীলতা; এবং তৃতীয়টি হলো, বিচক্ষণতা।

শৃঙ্খলা কি ? সাধারণ মানুষ বা সত্যানুসন্ধানী সে যেই হউক প্রত্যেককে অবশ্যই সৎ আচরণের জন্য শীল প্রতিপালন করতে হবে। তাকে অবশ্যই তার শরীর ও মন

সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

উভয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারকে পাহারায় রাখতে হবে। খারাপ যে কোন কিছুর প্রতি তার ভয় থাকতে হবে এবং সবসময়ে তাকে কুশল কর্ম সম্পাদনে সচেষ্ট থাকতে হবে।

মনের স্থিতিশীলতা মানে কি ? এর অর্থ হলো, মনে যখন লোভ এবং খারাপ তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, তখন যত দ্রুত সম্ভব তাকে এগুলো হতে দূরে সরিয়ে নেয়া এবং মনকে পরিশুদ্ধ ও শান্ত রাখা।

বিচক্ষণতা বলতে কি বুঝায় ? এর অর্থ হলো, চারি আর্য সত্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা এবং ধৈর্য্যের সাথে তা গ্রহণ করা; দুঃখের কারণ এবং তার স্বভাবকে জানা; দুঃখের কারণ সম্পর্কে জানা; দুঃখ নিরোধের উপায়গুলো জানা এবং আর্য-সত্যকে জানা, যা দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের দিকে নিজেকে পরিচালিত করে।

যারা আন্তরিকভাবে উপরোক্ত তিনটি পথ অনুশীলন করে তাদেরকে সত্যিকারভাবে বুদ্ধের শিষ্য বলা যেতে পারে।

ধরা যাক, একটি গাধা যার গরুর মতো সুন্দর শারীরিক কাঠামো, কন্ঠস্বর এবং শিং নেই; সে যদি গরুর পালের পিছনে গিয়ে দাবী করে, "দেখ, আমিও একটি গরু।" কেহ কি তাকে বিশ্বাস করবে ? তদ্রুপ ইহাও হবে বোকার মতো কাজ যদি না কোন লোক এই তিনটি পথ অনুশীলন না করে গর্ব করে যে, সে সত্যানুসন্ধানী বা বুদ্ধের শিষ্য।

শরৎকালে যখন কৃষক ফসল কাটে, অবশ্যই তার পূর্বে তাকে জমি চাষ করতে হয়, বীজ বপন করতে হয়, সেচ দিতে হয় এবং বসন্তকালে যখন জমিতে আগাছা জন্মায়, তখন তা পরিস্কার করতে হয়। অনুরূপভাবে, জ্ঞান অনুসন্ধানীকে অবশ্যই উক্ত তিনটি পথ অনুশীলন করতে হবে। একজন কৃষক যেমন আজ অন্কুর, কাল চারাগাছ এবং এর পরের দিন শস্য প্রত্যাশা করতে পারে না, তেমনি যদি কেউ জ্ঞান অর্জন করতে চায়, সেও আজ বৈষয়িক তৃষ্ণা থেকে মুক্তি, কাল আসক্তি ও খারাপ তৃষ্ণা থেকে মুক্তি এবং এর পরের দিন জ্ঞান অর্জনও আশা করতে পারে

না।

বীজ বপনের পরে, গাছ থেকে ফল উৎপাদন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পরিবর্তিত আবহাওয়ায় কৃষককে যেমন ধৈর্য্য সহকারে গাছের নানা ধরনের পরিচর্যা করতে হয়, তেমনি জ্ঞানের অনুসন্ধানীদেরকেও উক্ত তিনটি পথ অনুশীলনের মাধ্যমে ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের সাথে জ্ঞানের ভূমিতে চাষাবাদ করতে হয়।

২। যতক্ষণ পর্যন্ত মন তৃষ্ণাসক্ত হয়ে অস্থিতিশীল অবস্থায় থাকে, এবং আরাম-আয়েশের লালসায় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানলাভ করা বা জ্ঞান অর্জনের দিকে ধাবিত হওয়া খুবই কঠিন। জীবনকে উপভোগ করা এবং সত্যকে উপভোগ করার মধ্যে বিস্তর তফাৎ আছে।

পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে, মনই সমস্ত কিছুর উৎস। যদি মন বৈষয়িক কিছুকে উপভোগ করতে চায়, তাহলে মায়ামরীচিকা এবং দুঃখ তাকে প্রতিনিয়ত তাড়া করবে। কিন্তু মন যদি সত্যের পথানুসন্ধানে ধাবিত হয়, তাহলে সুখ, প্রশান্তি ও জ্ঞানকে সে উপভোগ করতে পারবে।

অতএব, যারা জ্ঞানের অনুসন্ধানী, তাদের মনকে পরিশুদ্ধ রাখা উচিৎ এবং ধৈর্য্যের সাথে তিনটি পথকে ধরে রাখা ও অনুশীলন করা উচিৎ। যদি তারা শীল প্রতিপালন করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই মনের স্থিতিশীলতা লাভ করবে; এবং এর ফলে জ্ঞান অর্জন করা তাদের জন্য স্বাভাবিক হবে। পরিশেষে এই জ্ঞান তাদেরকে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার দিকে ধাবিত করবে।

বস্তুতপক্ষে, এই তিনটি পথই (শীল পালন করা, মনকে স্থিতিশীলতায় রাখা এবং সর্বদা বিচক্ষণতার দ্বারা কিছু করা) জ্ঞান অর্জনের জন্য সঠিক পথ বা উপায়।

এই সব পথগুলো অনুসরণ না করলে, মানুষের মনের পুঞ্জিভূত মোহ দূরিভূত করতে অনেক সময় লাগবে। বৈষয়িক লোকদের সাথে তর্ক না করে, তাদের উচিৎ জ্ঞান অর্জনের জন্য অন্তঃস্থিত বিশুদ্ধ মনকে ধৈর্য্যের সাথে সাধনা-মগ্ন রাখা।

সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

৩। যদি আমরা অনুশীলনের এই তিনটি পথকে বিশ্লেষণ করি, তাহলে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, চারি প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি, চারি প্রকার প্রক্রিয়া, পাঁচ প্রকার বল এবং ছয় প্রকার বিশুদ্ধিতা অনুশীলনের কথা বেরিয়ে আসবে।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গগুলো হলো, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, ও সম্যক সমাধি।

সম্যক দৃষ্টির অর্থ হলো, চারি আর্য সত্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝা, কার্য-কারণ নিয়ম সম্পর্কে বিশ্বাস স্হাপন করা এবং বৈষয়িক অবকাঠামো বা তৃষ্ণা দ্বারা প্রতারিত না হওয়া।

সম্যক সংকল্প মানে, দৃঢ়তার সাথে তৃষ্ণা, লোভ, রাগ এবং অকুশল কর্ম না করার জন্য সংকল্প বদ্ধ হওয়া।

সম্যক বাক্য মানে, মিথ্যা না বলা, নিরর্থক কথা না বলা, কটুক্তিপূর্ণ কথা না বলা এবং দ্বিমুখি কথা না বলা।

সম্যক কর্ম মানে, কোন জীবন ধ্বংস না করা, চুরি না করা এবং ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া।

সম্যক জীবিকা মানে, প্রাণী বাণিজ্য বাদে বা যার দ্বারা জীবনে লজ্জা ডেকে আনতে পারে, এরূপ জীবিকা হতে বিরত হওয়াকে বুঝায়।

সম্যক প্রচেষ্টার অর্থ হলো, সঠিক লক্ষ্যের প্রতি নিজেকে নিবেদিত করা।

সম্যক স্মৃতি মানে, একটি বিশুদ্ধ ও চিন্তাশীল মন পরিচালনা করা।

সম্যক সমাধি মানে, চিত্তের মধ্যে উৎপন্ন বস্তুর প্রতি সঠিকভাবে এবং শান্তভাবে

মনকে ধরে রাখা এবং মনের বিশুদ্ধ মৌলিকতাকে অনুসন্ধান করা।

৪। চারি দৃষ্টি ভঙ্গি মানে, প্রথমতঃ শরীরকে অশুভ হিসেবে ভাবা এবং একে সকল প্রকার আসক্তি হতে মুক্ত করতে চেষ্টা করা; দ্বিতীয়তঃ পঞ্চস্কন্ধকে দুঃখের উৎস হিসেবে ভাবা, তার মধ্যে বেদনা বা শান্তি উৎপন্ন হলে তাকেও; তৃতীয়তঃ মনকে পরিবর্তনের প্রবাহ হিসেবে ভাবা যেতে পারে; এবং চতুর্থতঃ এ পৃথিবীতে সমস্ত কিছুই কার্য-কারণ নিয়মের মাধ্যমে সংগঠিত হচ্ছে এবং কিছুই শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে না।

৫। চারটি সম্যক প্রক্রিয়া হলো, প্রথমতঃ যে কোন খারাপ বা অকুশল কাজকে মনে উৎপন্ন না করা; দ্বিতীয়টি হলো, অকুশল কর্ম যদি করাও হয়, তাহলে তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধ করা; তৃতীয়তঃ কুশল কর্মের প্রতি মনকে নিয়োজিত করা এবং চতুর্থতঃ যে কুশল কর্ম ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে, এর বর্ধিতকরণ এবং একে প্রশংসা করা। এই চারি প্রকার প্রক্রিয়াকে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে পালন করা উচিৎ।

৬। পঞ্চবল হলো, প্রথমতঃ শ্রদ্ধাশক্তির প্রতি বিশ্বাস; দ্বিতীয়তঃ প্রচেষ্টার প্রতি সদিচ্ছা; তৃতীয়তঃ মনের জাগ্রত অবস্থা বা স্মৃতি; চতুর্থতঃ নিজের মনকে স্হিতিশীলতায় আনার ক্ষমতা বা সমাধি এবং পঞ্চমতঃ স্বচ্ছ জ্ঞানলাভের জন্য সক্ষমতা অর্জন বা প্রজ্ঞা। এ পঞ্চবল জ্ঞান অর্জনের জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

৭। জ্ঞান অর্জনের অপর ছয়টি উপায় হলো, দান পারমী, শীল পারামী, বীর্য পারামী, ক্ষান্তি পারামী, সমাধি ও প্রজ্ঞা পারামীর মাধ্যমে। এসকল পথ অনুসরণের দ্বারা যে কোন ব্যক্তি অবশ্যই মোহের মোহনা হতে জ্ঞানের মোহনায় পৌঁছাতে পারে।

দান পারামী অনুশীলনের দ্বারা একজন মানুষ স্বার্থপরতা হতে মুক্তি লাভ করতে পারে; শীল অনুশীলনের দ্বারা মানুষের সম্যক মননশীলতা রক্ষা করা যায় এবং অন্যের জন্যেও স্বস্তিদায়ক হয়; বীর্য পারামী অনুশীলনের দ্বারা মনের ভীতি এবং

সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

রাগভাব নিয়ন্ত্রণ করা যায়; ক্ষান্তি পারামীর অনুশীলন মানুষকে অধ্যবসায়ী ও বিশ্বস্ত হতে সাহায্য করে; সমাধি অনুশীলনের দ্বারা অস্থিতিশীল ও দুরন্ত মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়; এবং প্রজ্ঞা অনুশীলনে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দ্বিধাগ্রস্ত মনকে একটি সুস্পষ্ট ও গভীর জ্ঞানজগতে পরিবর্তন করা যায়।

দান দেয়া ও শীল প্রতিপালন করা মানে একটি প্রাসাদ তৈরী করার প্রয়োজনীয় ভিত গড়ে তোলা। বীর্য ও ক্ষান্তি হলো প্রাসাদের দেয়াল স্বরূপ, যা বাহিরের শত্রু হতে প্রাসাদকে রক্ষা করে। সমাধি ও প্রজ্ঞা হলো, ব্যক্তিগত বর্ম, যা কোন ব্যক্তিকে জীবন ও মরণের আকস্মিক আঘাত থেকে রক্ষা করে।

যদি কোন ব্যক্তি তার সুবিধাজনক সময়েই শুধু দান দিয়ে থাকে, বা দান না দেয়ার চেয়ে দেয়াটা সহজ, একেও অবশ্য দান বলা যায় কিন্তু এটাকে সত্যিকার অর্থে দান বলা যায় না। কারো অনুরোধের পূর্বেই সত্যিকার অর্থের দান করুণাভরা অন্তরের দ্বারা সম্পাদন করা হয়, এবং সত্যিকারের দান হলো, যা সময়ে সময়ে নয় বরং প্রতিনিয়ত সম্পাদন করা হয়।

দান কাজটি করার পর, যদি অনুশোচনা বা অহংকারমূলক কোন অনুভূতি নিজের মনে উৎপন্ন হয়, তবে তাকে কখনো সত্যিকার অর্থে দান বলা যাবে না। সত্যিকার অর্থে দান হলো তাই, যা আনন্দের সাথে প্রদান করা হয়, নিজেকে দাতারূপে মনে না করে, কে গ্রহীতা, বা কি দান করা হচ্ছে ইত্যাদি চিন্তা না করে সম্পাদন করা।

সত্যিকার অর্থে দান হলো, যা নিজের অকৃত্রিম করুণাময় হৃদয় হতে উৎপন্ন হয়, যা কোন প্রকার প্রতিদানের প্রত্যাশা ছাড়াই স্বতস্ফুর্তভাবে উৎসারিত হয়, এবং যার মাধ্যমে জ্ঞানের জগতে প্রবেশের ইচ্ছা থাকে।

সাত প্রকারের দান রয়েছে, যা সাধারণ মানুষেরা অনুশীলন করতে পারে। এর প্রথমটি হলো, শারীরিক দান। ইহার অর্থ হলো শারীরিক শ্রম দান করা। এ ধরনের দানের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট দান হলো, নিজের জীবনকে দান করে দেয়া। দ্বিতীয়টি হলো, আধ্যাত্মিক দান। তাহলো, নিজের করুণাভরা অন্তরের মাধ্যমে অন্যকে

সাহায্য করা। তৃতীয়টি হলো, চক্ষু যুগল দান করা। এইটি হলো, নিজের দৃষ্টি শক্তি অন্যকে দান করা যা তাদের মানসিক প্রশান্তি এনে দেবে। চতুর্থটি হলো, সম্মতি দান করা। ইহা হলো অন্যের সৎকাজের প্রতি আনন্দোজ্জ্বল ও কোমল মনে সম্মতি জ্ঞাপন বা সমর্থন দেয়া। পঞ্চমটি হলো, বাক্য দান। তাহলো নিজের দয়ালু ও উষ্ণ-উৎফুল্ল কথাবার্তার মাধ্যমে অন্যকে সাহায্য করা। ষষ্ঠটি হলো, আসন প্রদান করা। এর অর্থ হলো, নিজের বসার আসন অপরকে প্রদান করা। সপ্তমটি হলো, আশ্রয় দান করা। তাহলো, অন্যকে নিজের আবাস স্হলে রাত্রি যাপন করতে সুযোগ দেয়া। উপরোক্ত দানগুলো যে কোন কেহ প্রতিদিন তার ব্যবহারিক জীবনে অনুশীলন করতে পারে।

৮। একদা এক রাজ্যে সত্ত্বা নামের এক রাজকুমার বাস করতেন। একদিন তিনি এবং তাঁর দুই বড় ভাই একসাথে পাশের এক বনে খেলতে বের হলেন। সেখানে তাঁরা দেখলেন, একটি ক্ষুধার্ত বাঘিনী তার গর্ভজাত সাত বাচ্চাকে ক্ষুধা নিবারণের জন্য খেতে উদ্যত হলো।

তাঁর বড় দুই ভাই তা দেখে ভয়ে পালিয়ে গেলেন, কিন্তু সত্ত্বা বাঘের বাচ্চাদের জীবন রক্ষা করার জন্য বনের একটি উঁচু জায়গায় উঠে বাঘিনীর সম্মুখে নিজেকে নিক্ষেপ করলেন।

যুবরাজ স্বতঃস্ফুর্ততার সাথে এ দান কাজটি সম্পাদন করলেন, এবং তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন ঃ "এ দেহ পরিবর্তনশীল, স্হায়ী নয়; আমি এ দেহকে ভালবাসতাম ঠিকই কিন্তু একে কোথাও নিক্ষেপ করতেও আমি কুন্ঠিত নই, এখন আমি এ দেহ বাঘিনীকে দান করবো এবং জ্ঞানের অধিকারী হবো।" এ চিন্তার মাধ্যমে যুবরাজ সত্ত্বার জ্ঞান উপলব্ধি করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে।

৯। জ্ঞান অনুসন্ধানীদের উচিৎ মনের চারটি শ্রেষ্ট অবস্হাকে অনুশীলন করা। এগুলো হলো, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা। যদি কেহ মৈত্রীর অনুশীলন করে, তাহলে সে লোভ থেকে মুক্ত হতে পারে; করুণা অনুশীলনের দ্বারা দ্বেষ থেকে; মুদিতা অনুশীলনের দ্বারা দুঃখ থেকে এবং পরিশেষে উপেক্ষা অনুশীলনের দ্বারা শত্রু

ও বন্ধুদের মধ্যে বৈষম্যতামূলক অভ্যাস হতে মুক্ত হওয়া যায়।

মহামৈত্রী মানুষকে সুখী ও পরিতৃপ্তি দান করে। যা মানুষকে লাভ করতে দেয়না, তা নির্মুল করতে মহাকরুণা সহযোগিতা করে। মহামুদিতা প্রত্যেক মানুষকে সুখী ও মানসিক আনন্দে তৃপ্ত রাখে। যখন প্রত্যেকে খুশী ও মানসিক পরম শান্তি এবং আনন্দে অবস্হান করে, তখন একে অপরের প্রতি মহাউপেক্ষা বা সমতাভাব অনুভব করতে পারে।

কেউ যদি যত্ন সহকারে মনের এই চারি মহা অবস্হাকে অনুশীলন করতে পারে, তাহলে তারা লোভ, দ্বেষ, মোহ, দুঃখ এবং ভালবাসা-ঘৃণা প্রভৃতি থেকে মুক্ত হতে পারে, যদিও তা সহজ কাজ নয়। মন থেকে অকুশল কর্মকে তাড়ানো খুবই কঠিন, যা শিকারী কুকুরের ন্যায়। অন্যদিকে কুশল কর্মকে তাড়ানো খুবই সহজ, যা বনের হরিণের ন্যায়। অথবা মন থেকে অকুশল কর্মকে মুছে ফেলা খুবই কঠিন, যা পাথরের মধ্যে খোদাই করা অক্ষরের ন্যায়। অন্যদিকে মন থেকে কুশল কর্মকে মুছে ফেলা খুবই সহজ, যা জলে লিখা অক্ষরের ন্যায়। বস্তুতপক্ষে, জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো নিজেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য তৈরী করা।

১০। এক গ্রামে কোন এক ধনী পরিবারে স্মরণ নামের এক যুবক জন্ম গ্রহণ করে। তার শরীরটি ছিল খুবই কোমল। সে জ্ঞান অর্জনের জন্য খুবই আন্তরিক ছিল, এবং পরবর্তীতে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো। জ্ঞান অর্জনের জন্য সে এতবেশী পরিশ্রম করেছিল যে, এতে তার পা দিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হলো।

বুদ্ধ দয়াপরবশ হয়ে তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন যে, "হে বালক স্মরণ ! তুমি কি তোমার বাড়ীতে কখনও বীণা বাজানো শিক্ষা করেছিলে ? তুমি জান কি বীণা সুর সৃষ্টি করতে পারে না, যদি এর তারগুলোর বিন্যাস শক্ত বা ঢিলা হয়। ইহা তখনই সুর সৃষ্টি করে, যখন এর তারগুলো সঠিক বিন্যাসে বাধা হয়।"

"জ্ঞান অর্জনের প্রশিক্ষণ বাদ্যযন্ত্রের তারের সমন্বয়ের মতো। কেউ জ্ঞান অর্জন করতে পারে না, যদি তাদের মনের তারের বিন্যাসগুলো খুবই ঢিলা বা শক্ত হয়।

জ্ঞান অর্জন করতে হলে, অবশ্যই বিবেচনা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে কাজ করতে হবে।"

স্মরণ এ কথাগুলোকে খুবই মূল্যবান ভেবেছিল এবং অবশেষে সে যা চেয়েছিল তা লাভ করেছিল।

১১। একদা এক রাজ্যে এক যুবরাজ বাস করতেন, যিনি পাঁচ প্রকার অস্ত্রচালনায় দক্ষ ছিলেন। একদিন তিনি অনুশীলন শেষে, রাজপ্রাসাদে ফেরার পথে, এক বিকৃত গঠনের জীবের দেখা পেলেন যার চামড়া ছিল দুর্ভেদ্য।

জীবটি তাঁর দিকে এগিয়ে আসল, কিন্তু তা যুবরাজকে সন্ত্রস্ত করতে পারলো না। তিনি তার দিকে তীর নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু ঐ তীর জীবটিকে কোন আঘাত করতে পারলো না। এরপর তিনি পুনঃ তীর নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু তার মোটা চামড়া ভেদ করতে পারলো না। এরপর তিনি ডান্ডা ও বল্লম নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু এগুলোও জীবটিকে আঘাত করতে পারলো না। অতঃপর তিনি তাঁর তলোয়ার ব্যবহার করলেন, কিন্তু তা ভেঙ্গে গেল। যুবরাজ এরপর ঘুষি ও লাথি মারলেন, কিন্তু কোন কাজ হলো না। অবশেষে, জীবটি যুবরাজকে তার বিশাল বাহুতে জোরে জাপটে ধরল এবং ঝাঁকরাতে লাগল। যুবরাজ শেষ পর্যন্ত তাঁর মাথাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলেন, কিন্তু এতেও ব্যর্থ হলেন।

জীবটি বললো, "আমাকে বাধা দেয়া অর্থহীন; আমি তোমাকে গিলে খেতে যাচ্ছি।" কিন্তু যুবরাজ প্রত্যুত্তরে বললেন, " তুমি হয়তো ভাবতে পারো আমি আমার সব অস্ত্র ব্যবহার করেছি এবং আমি অসহায়, কিন্তু আমার এখনও একটি অস্ত্র বাকী রয়ে গেছে। যদি তুমি আমাকে গিলে ফেল, তাহলে আমি তোমার পাকস্হলীর ভেতর থেকে তোমাকে ধ্বংস করবো।"

যুবরাজের সাহস জীবটিকে বিস্মিত করল এবং সে জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি কিভাবে তা করবে ?" যুবরাজ প্রত্যুত্তরে বললেন, "সত্যের শক্তি দিয়ে।"

সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

এরপর, জীবটি তাঁকে মুক্ত করে দিল এবং সত্যের পথে এগুনোর জন্যে তাঁর নির্দেশনা প্রার্থনা করলো।

এ কাহিনীর শিক্ষা হলো, শিষ্যদেরকে তাদের প্রচেষ্টার প্রতি অধ্যবসায়ী হতে উৎসাহিত করা এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতার মুখে নিজেকে স্থিতিশীল অবস্থায় ধরে রাখা।

১২। ঘৃণ্য আত্ন-অহংকার এবং পাপে লজ্জাহীনতা উভয়েই মানব সমাজকে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু আত্ন-সম্মান ও পাপে লজ্জা, মানব সমাজকে রক্ষা করে। লোকেরা তাদের পিতা-মাতা, বয়োজৈষ্ঠ্য ও ভাই-বোনদেরকে সম্মান করে। কারণ তারা আত্ন-সম্মান ও পাপে লজ্জার প্রতি সংবেদনশীল। আত্ন পর্যালোচনার পর নিজের সম্মান ধরে রাখা এবং অন্য লোকদেরকে দেখে পাপে লজ্জিত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

যদি কোন লোক পাপের প্রতি অনুতাপ চেতনা পোষণ করে, তাহলে এতে তার পাপ একদিন মোচন হয়ে যায়। কিন্তু যদি সে অনুতপ্ত না হয়, তাহলে তার পাপ চলতেই থাকে এবং তাকে চিরকালের জন্য এই পাপ অভ্যাস আচ্ছন্ন করে রাখবে।

কেবল মাত্র এসব ব্যক্তিই উপরোক্ত শিক্ষা দ্বারা লাভবান হয়, যারা সঠিকভাবে এই সম্যক শিক্ষা সম্পর্কে শুনে, এবং এর প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে পারে।

যদি কোন লোক কেবল মাত্র সত্যিকার শিক্ষা শুনে, কিন্তু ধারণ করে না, জ্ঞান অনুসন্ধানে সে ব্যর্থ হয়।

যারা জ্ঞানের অনুসন্ধানী তাদের কাছে বিশ্বাস, বিনয়, নিরহংকার, উদ্যম এবং প্রজ্ঞা বিপুল শক্তির উৎস স্বরূপ। এগুলোর মধ্যে প্রজ্ঞা হলো সর্বোত্তম এবং অন্যগুলোকে এর অপরিহার্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। যদি কোন লোক প্রশিক্ষণকালে জাগতিক বিষয়াদির প্রতি মোহগ্রস্ত হয়, নিরর্থক বাক্যালাপে মত্ত হয়, বা ঘুমে অবচেতন হয়ে পড়ে; তাহলে সে জ্ঞান অনুসন্ধানের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

১৩। জ্ঞান লাভের অনুশীলনে কেহ কেহ অন্যদের চাইতে দ্রুত সফল হতে পারে। সুতরাং অন্যদের এগিয়ে যাওয়া দেখে কারো নিরুৎসাহিত হয়ে পড়া উচিৎ নয়।

যখন একজন লোক ধনুবিদ্যার প্রশিক্ষণ নেয়, তখন অতিদ্রুত সফলতার প্রত্যাশা করা উচিৎ নয়। কিন্তু তার জানা উচিৎ, যদি সে ধৈর্য্য ধরে প্রশিক্ষণ চালিয়ে যায়, তাহলে ক্রমান্বয়ে তার বিদ্যা অর্জন নির্ভুল হবে। একটি নদী স্রোতস্বিনী হিসেবে যাত্রা শুরু করে, কিন্তু যখন ইহা সাগরে পতিত হয়, তখন ইহা বিরাট আকার ধারণ করে।

উপরোক্ত উদাহরণের ন্যায়, যদি কোন লোক ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সাথে প্রশিক্ষণে নিয়োজিত থাকে, তবে সে অবশ্যই জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যদি কেহ তার চক্ষু যুগল খোলা রাখে, তাহলে সর্বত্র সে শিক্ষা গ্রহণের উপাদান খুঁজে পাবে। যার ফলে তার জ্ঞান অর্জনের সুযোগ হবে সীমাহীন।

একদা কোন এক গ্রামে এক লোক ছিল, যে সবসময় ধূপ প্রজ্জ্বলিত করতো। সে লক্ষ্য করলো যে, ধূপের কোন সুঘ্রাণ আসছেও না, আবার যাচ্ছেও না। সুঘ্রাণকে আছেও বলা যাচ্ছে না, আবার নাইও বলা যাচ্ছে না। এ সামান্য ঘটনা তাকে জ্ঞান অর্জনের দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

একদা এক ব্যক্তি তার পায়ে কাটা বিঁধে আঘাত পেল। সে এতে তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল এবং তার মাথায় হঠাৎ একটি চিন্তা এসেছিল যে, এই ব্যথা মনের প্রতিক্রিয়া মাত্র। এই ঘটনার পর সে এরূপ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলো যে, যদি নিজে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তাহলে তা আয়ত্তের বাহিরে চলে যেতে পারে। আবার যদি কেহ মনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে, তাহলে তা বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। এই চিন্তা হতে কিছু দিন পরে, জ্ঞান অর্জন তার কাছে সহজ হয়ে দেখা দেয়।

সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

এক স্থানে অন্য এক লোভী লোক বাস করত। একদিন সে তার লোভী মনকে নিয়ে ভাবছিল এবং সে বুঝতে পারছিল যে লোভমূলক চিন্তা এবং এর কারণগুলো তাকে প্রজ্ঞার আগুনে জ্বালিয়ে দিতে পারে বা নিঃশেষ করে ফেলতে পারে। তার এই বোধশক্তি ছিল জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রথম স্তর।

পুরনো একটি প্রবাদে আছে, "তোমার মনকে স্থিতিশীল অবস্থায় রাখো। যদি মনকে স্থিতিশীল অবস্থায় রাখা যায়, তাহলে সমগ্র পৃথিবীকেও স্থির বলে মনে হবে।" এই কথাটি বিবেচনা করলে এটাই বুঝা যায় যে, এই পৃথিবীতে যত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তা মানসিক বৈষম্যগত কারণেই ঘটে থাকে। এই বাক্যগুলোর মধ্যে জ্ঞান লাভের পথ নির্দেশিকা নিহিত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, জ্ঞান অর্জন একটি মাত্র পথের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়।

৩

বিশ্বাসের পথ

১। যে বা যারা বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই মহারত্নত্রয়ের স্মরণ গ্রহণ করে, তাদেরকে বুদ্ধের অনুসারী হিসেবে অভিহিত করা যায়। মনের স্থিতিশীলতার জন্য বুদ্ধের অনুসারীরা শীল, শ্রদ্ধা, দান ও প্রজ্ঞা এই চারি প্রকার পথ অনুশীলন করে থাকে।

বুদ্ধের অনুসারীরা পঞ্চশীল অনুশীলন করে। এগুলো হল, প্রাণী হত্যা হতে বিরত থাকা, চুরি করা থেকে বিরত থাকা, ব্যভিচার হতে বিরত থাকা, মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকা এবং যে কোন ধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনে বিরত থাকা।

বুদ্ধের অনুসারীরা তাঁর সর্বজ্ঞতাজ্ঞানকে বিশ্বাস করে। তারা তাদের মনকে লোভ ও স্বার্থপরতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয় এবং দান কার্য সম্পাদন করে। তারা কার্য-কারণ নিয়ম সম্পর্কে বুঝে, এবং তারা এও জানে জ্ঞানের মানদন্ডে জীবনের উপস্থিতি ক্ষণস্থায়ী।

একটি বৃক্ষ যদি পূর্বদিকে হেলে থাকে, স্বাভাবিকভাবে এর পতনও হবে পূর্বদিকে। তাই, যারা বুদ্ধের শিক্ষা শ্রবণ করে এবং এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তারাও অবশ্যই বুদ্ধের পবিত্র ভূমিতে (শুদ্ধাবাস) জন্মগ্রহণ করবে।

২। ইহা যথাযথভাবে বলা যায়, বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এ ত্রিরত্নকে যারা বিশ্বাস করে, তাদেরকে বুদ্ধের অনুসারী বলা যায়।

বুদ্ধ হলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি সর্বজ্ঞতাজ্ঞান অর্জন করেছেন এবং এ অর্জনকে মানবতার বন্ধনমুক্তি ও হিতে ব্যবহার করেছেন। ধর্ম হলো সত্য, যা বুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ বা শিক্ষা, যা তিনি প্রচার করে গেছেন। সংঘ হলো, বুদ্ধ ও ধর্মে বিশ্বাসীদের প্রকৃত ভ্রাতৃসমাজ।

আমরা বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ সম্পর্কে আলোচনা করি, যেহেতু তাঁরা তিনটি রত্ন। কিন্তু আসলে তাঁরা এক ও অভিন্ন। বুদ্ধ তাঁর প্রবর্তিত ধর্মে প্রকাশিত হয়; আবার ধর্ম সংঘের মাধ্যমে প্রতিপালিত হয়। সুতরাং, ধর্মে বিশ্বাস এবং সংঘকে রক্ষা করার মাধ্যমে বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাসকেই প্রকাশ করে। আবার বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস মানে ধর্মের প্রতি বিশ্বাস এবং সংঘের প্রতি বিশ্বাসকেই বুঝায়।

অতএব, মানুষেরা মুক্তিলাভের জন্য এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য শুধু বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেই হয়। বুদ্ধ হলেন একজন সর্বজ্ঞ, যিনি এ পৃথিবীর সবাইকে আপন সন্তানের মতো ভালবাসেন। তাই, যদি কেহ বুদ্ধকে তার পিতার মতো ভাবতে পারে, তখন সে নিজেকে নিজে বুদ্ধের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে দেখতে পায় এবং জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়।

পরিশেষে, যারা বুদ্ধকে এভাবে মনে করে, বুদ্ধ তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে এবং তাঁর আশীর্বাদের মাধ্যমে তাদেরকে সহযোগিতা করেন।

৩। এ পৃথিবীতে বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া, কোন কিছুই এত সফলতা বয়ে

আনতে পারে না। কেবল বুদ্ধের নাম স্মরণ, তাঁর প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্টির দ্বারা মুহূর্তের মধ্যেই, অতুলনীয় লাভবান হওয়া যায়।

সুতরাং, এ পৃথিবীর অগ্নি প্রাজ্বলতার ভিতর বাস করেও সবারই উচিৎ বুদ্ধ অনুসৃত পথ অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিজেকে সন্তুষ্ট রাখা।

এমন কোন শিক্ষকের দর্শন পাওয়া বড়ই কঠিন, যিনি ধর্ম সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারেন। এর চেয়েও কঠিন বুদ্ধের দর্শন লাভ করা; কিন্তু সবচেয়ে কঠিন তাঁর শিক্ষার প্রতি বিশ্বাস স্হাপন করা।

অতএব, এখন তোমরা বুদ্ধের দর্শন পেয়েছো, যাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা কঠিন, তোমাদেরকে তাঁর সম্পর্কে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, যা শ্রবণ করা কঠিন, তোমাদের তাতে আনন্দ লাভ এবং বিশ্বাস স্হাপন করা উচিৎ; পাশাপাশি বুদ্ধের প্রতিও বিশ্বাস স্হাপন করা উচিৎ।

৪। মানব জীবনের দীর্ঘ পরিক্রমায় বিশ্বাস হলো সর্বোত্তম সাথী। ইহা ভ্রমণে সর্বোত্তম সজীবতা প্রদান করে; এবং ইহা সর্বাপেক্ষা নিরাপদ সম্পদ।

বিশ্বাস হলো হাত সদৃশ যা ধর্মকে গ্রহণ করে। ইহা হলো বিশুদ্ধ হাত যা সকল গুণাবলী ধারণ করে। বিশ্বাস হলো আগুন যা সকল জাগতিক মোহকে গিলে ফেলে। ইহা বোঝাকে সরিয়ে দেয় এবং মানুষকে পথ নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

বিশ্বাস লোভ, ভয় ও অহংকারকে দূরীভূত করে। ইহা সঠিক আচরণ এবং অন্যকে সম্মান করতে শিক্ষা দিয়ে থাকে। ইহা মানুষকে পরিস্হিতির নানা বন্ধন হতে মুক্ত করে। ইহা কঠিনতার মোকাবেলা করার সাহস জোগায় এবং প্রলোভন এড়ানোর ক্ষমতা প্রদান করে। ইহা কারো কাজকে বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল রাখতে সক্ষম করে তোলে এবং ইহা মনকে জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ করে।

বিশ্বাস হলো উৎসাহ প্রদানের ন্যায়। যখন কারো জীবন দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর হয়ে

পড়ে, বিশ্বাস তখন তাকে জ্ঞানের দিকে ধাবিত করে।

বিশ্বাস আমাদেরকে এটাই অনুভব করতে শিক্ষা দেয় যে, আমরা বুদ্ধের উপস্থিতির মাঝে অবস্থান করছি এবং ইহা আমাদেরকে বুদ্ধের কাছে নিয়ে যাবে, যেখানে আমরা তাঁর দ্বারা উপকৃত হবো। বিশ্বাস আমাদের কঠোর ও স্বার্থপর মনকে কোমল করে এবং ইহা আমাদের মধ্যে অপরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন চেতনা সৃষ্টি করে দিয়ে সহানুভূতিকে বুঝতে সাহায্য করে।

৫। বুদ্ধের প্রতি যাদের বিশ্বাস আছে, তারা জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধের শিক্ষাকে যেভাবে শ্রবণ করে, ঠিক সেভাবে বুঝতে সক্ষম হয়। যাদের বিশ্বাস আছে, তারা জ্ঞান অর্জন করে এবং সব কিছু দর্শন করতে সক্ষম হয়, যা কার্য-কারণ নিয়মানুসারে উৎপন্ন হয়। বিশ্বাস তাদের ধৈর্য্যের সাথে যে কোন কিছু গ্রহণ করার এবং শান্তভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সহযোগিতা প্রদান করে।

বিশ্বাস তাদের জীবনের ক্ষণস্থায়ীতাকে বুঝার জ্ঞান দান করে এবং আশীর্বাদ প্রদান করে, যাতে জীবনের চলার পথে যাই মোকাবেলা করতে হউক না কেন, তাতে যেন বিস্মিত বা দুঃখ উপলব্ধি করতে না হয়। অতএব, বিশ্বাস ইহাও শিক্ষা দেয় যে, পরিস্থিতি এবং বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে; কিন্তু জীবন সত্য সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে।

বিশ্বাসের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা বিদ্যমান; যা হলো-অনুশোচনা, অন্যের গুনের প্রতি সত্যিকার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতা চিত্তে বুদ্ধের উপস্থিতিকে গ্রহণ করা।

মানুষের উচিৎ বিশ্বাসের এ উপাদানগুলোকে অনুশীলন করা। তারা তাদের ব্যর্থতা ও অবিশুদ্ধিতার প্রতি সংবেদনশীল হওয়া উচিৎ। এজন্য তাদেরকে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া উচিৎ। তাদের মুক্ত মনে অন্যের ভাল আচরণ ও ভাল কাজের স্বীকৃতি দানের অনুশীলন এবং এজন্য তাদের প্রশংসা করা উচিৎ। তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে বুদ্ধের সাথে কাজ করা ও বুদ্ধের সাথে বাস করা উচিৎ।

সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

বিশ্বাসের অর্থ হচ্ছে মনের সততা। ইহা হলো একটি গভীর মন। আন্তরিকভাবে আনন্দিত মন বুদ্ধের করুণার দ্বারা পবিত্র বুদ্ধভূমির দিকে এগিয়ে যায়।

সুতরাং, বুদ্ধ বিশ্বাসকে তাই এত বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষেরা তাঁর পবিত্র ভূমিতে এগিয়ে যেতে পারে। বিশ্বাসের শক্তি মানুষকে পবিত্র করে তুলতে পারে। এ শক্তি মানুষকে আত্ম-অহংকারবোধ থেকে রক্ষা করতে পারে। এমনকি, যদি তারা সারা পৃথিবীতে বুদ্ধের নামের প্রশংসা শুনে ক্ষণিকের জন্যও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্হাপন করে, তা তাদেরকে বুদ্ধের পবিত্র ভূমির (শুদ্ধাবাস) দিকে পরিচালনা করে।

৬। বিশ্বাস এমন কোন জিনিষ নয়, যা বৈষয়িক মনের সাথে একত্রিত হয়ে যায়। ইহা হলো, বুদ্ধ প্রকৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার জন্য মনের একটি সুস্পষ্ট ধারণা। যে বুদ্ধকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে, সে নিজেই বুদ্ধ। বুদ্ধের প্রতি যার বিশ্বাস আছে, সে নিজেই একজন বুদ্ধ।

কিন্তু নিজের ভিতরে যে বুদ্ধাঙ্কুর নিহিত আছে, তা উন্মোচন বা পুনরুদ্ধার করা খুবই কঠিন। লোভ, দ্বেষ ও বৈষয়িক মোহের দ্রুত উত্থান পতনের এ পৃথিবীতে, একটি বিশুদ্ধ মন রক্ষা করা খুবই কঠিন কাজ। যদিও বিশ্বাস মানুষকে তা জয় করতে সমর্থবান করে তোলে।

বিষময় (অনুর্বর) বনের মধ্যে এরান্ডা গাছেরই জন্মানোর সুযোগ থাকে, কিন্তু সুগন্ধীযুক্ত চন্দন গাছ জন্মানোর কোন সুযোগ থাকে না। ইহা সত্যিই আশ্চর্য্য ঘটনা, যদি এরান্ডা বনের মধ্যে চন্দন গাছ জন্মায়। অনুরূপভাবে, ইহাও আশ্চর্য্যজনক ঘটনা যে, মানুষের হৃদয়ে বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস জন্মানো।

অতএব, বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাসকে "শেকড়বিহীন" বিশ্বাস বলা যায়। এর অর্থ হলো, বিশ্বাসের কোন শেকড় নেই, যা মানুষের মনের মধ্যে জন্মাবে। কিন্তু এর শেকড় করুণাঘন বুদ্ধের মনে জন্মাতে পারে।

৭। তাই বিশ্বাস হলো, ফলপ্রদ ও পরিশুদ্ধ। কিন্তু অলস মস্তিষ্কে বিশ্বাস জাগ্রত করা খুবই কঠিন। বিশেষতঃ, পাঁচ প্রকারের সন্দেহ মানুষের মনের অন্তরালে ওঁত পেতে থাকে এবং বিশ্বাসকে নিরুৎসাহিত করে।

প্রথমতঃ, বুদ্ধত্বজ্ঞানের প্রতি সন্দেহ; দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি সন্দেহ; তৃতীয়তঃ, বুদ্ধের শিক্ষাকে যাঁরা ব্যাখ্যা করেন তাদের প্রতি সন্দেহ; চতুর্থতঃ, আর্য মার্গ সম্পর্কে বর্ণিত পথ ও পদ্ধতি সঠিক কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ; এবং পরিশেষে, এরূপ কিছু উগ্র ও অধৈর্য্য মানসিকতার লোক আছে, যারা বুদ্ধের শিক্ষাকে বুঝতে ও অনুসরণ করতে সক্ষম, সেই লোকদের আন্তরিকতার প্রতি সন্দেহ পোষণ করে।

বস্তুতপক্ষে, সন্দেহের চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছুই নেই। সন্দেহ মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। ইহা এমন এক ধরনের বিষ, যা বন্ধুত্ব ছিন্ন করায় এবং সুসম্পর্কে ভাঙ্গন ধরায়। ইহা কাঁটার মতো, যা বিদ্ধ করে এবং বেদনা সৃষ্টি করে। ইহা হলো তলোয়ার যা মানুষকে হত্যা করে।

বিশ্বাসের শুরু অনেক অনেক পূর্বে, যা করুণাঘন বুদ্ধ দ্বারা অনুশীলন করা হয়েছিল। যখন কারো মনে বিশ্বাস জন্ম নেয়, তখন সে সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে এবং বুদ্ধের প্রতি তাঁর কুশল কাজের জন্য কৃতজ্ঞ থাকে।

কারো এটা ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে, তার নিজস্ব সংবেদনশীলতার কারণেই মনে বিশ্বাস জাগ্রত হয়েছে। অনেক বছর পূর্বে বুদ্ধের করুণা মানুষের মনকে বিশ্বাসের পবিত্র আলোকে আলোকিত করেছিল; এবং এর দ্বারা তাদের মনের অজ্ঞতার অন্ধকার দুরীভূত হয়েছিল। বর্তমানে যে বিশ্বাস মানুষেরা প্রকাশ করছে, তা মূলতঃ ঐতিহ্যগতভাবে তাদের মনে লুকায়িত ছিল।

এমনকি সাধারণ জীবন যাপনকারী একজন ব্যক্তিও বুদ্ধ নির্দেশিত পবিত্র ভূমিতে জন্মগ্রহণ করতে পারে, যদি সে বুদ্ধের অনুসৃত দীর্ঘ চলমান করুণার পথকে অনুসরণ করে, তার মনে বিশ্বাসকে জাগ্রত করতে পারে।

সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

প্রকৃতপক্ষে, এ পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে জন্ম নেয়া খুবই কঠিন। ধর্ম শ্রবণ করাও কঠিন; বিশ্বাসকে জাগ্রত করা এরচেয়েও কঠিন; অতএব, প্রত্যেকের উচিৎ বুদ্ধের ধর্মশিক্ষা শ্রবণে সর্বোচ্চ সচেষ্ট হওয়া।

৪

বুদ্ধের বানী

১। "সে আমাকে কটুক্তি করেছে, সে আমাকে অবজ্ঞা করেছে, সে আমাকে আঘাত করেছে।" অতএব, কেহ যদি এভাবে চিন্তা করতে থাকে এবং কেহ যদি এ ধারণা দীর্ঘদিন দরে মনে ধরে রাখে, তাহলে তার রাগ অবিরত চলতে থাকবে।

মনে যতক্ষণ পর্যন্ত অপমানের জ্বালা থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাগ দূরীভূত হবে না। অপমান বোধের জ্বালা ভুলে গেলেই রাগ দূরীভূত হয়।

যদি বাড়ীর ছাদ ভালভাবে তৈরী করা না হয়, বা মেরামত করা না হয়, তাহলে বাড়ীর ভেতর ছিদ্র দিয়ে বৃষ্টির পানি ঢুকবে। সঠিকভাবে অনুশীলন না করলে এবং মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে, লোভ ঢুকে পড়বে।

অলসতা হলো মৃত্যুর পথে অগ্রসর হওয়ার সংক্ষিপ্ত পথ। আর অধ্যবসায়ী মানে জীবিত থাকার জন্য একটি সহজ পথ। বোকা লোকেরা অলস, কিন্তু জ্ঞানী লোকেরা হলো অধ্যবসায়ী।

একজন তীর প্রস্তুতকারী তার তীরকে সোজা করে তৈরী করতে চেষ্টা করে। তদ্রুপ, একজন জ্ঞানী ব্যক্তিও তার মনকে সোজা করে তৈরী করতে সচেষ্ট থাকে।

একটি বিচ্ছিন্ন চিন্তার চঞ্চল মন সর্বদা ক্রিয়াশীল, এদিক ওদিক লাফালাফি করে। একে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন। কিন্তু একটি শান্ত মন সর্বদা শান্তিপুর্ণভাবে অবস্হান

করে। সুতরাং, মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা জ্ঞানীর কাজ।

কোন শত্রু বা প্রতিপক্ষ নয়, মানুষের নিজের মনই নিজেকে খারাপ পথের দিকে প্রলুব্ধ করে।

যে লোক তার নিজের মনকে লোভ, দ্বেষ ও মোহ থেকে রক্ষা করতে পারে, সে লোকই প্রকৃত এবং চিরস্হায়ী শান্তি লাভ করতে পারে।

২। অনুশীলন ছাড়া সুমধুর বাক্যালাপ সুগন্ধবিহীন সুন্দর ফুলের ন্যায়।

ফুলের সুগন্ধী বাতাসের প্রতিকুলতায় প্রবাহিত হতে পারে না; কিন্তু সৎ লোকের সৎ গুণাবলীর সুঘ্রাণ এ পৃথিবীর যে কোন প্রবল বাতাসের অনুকুলে ও প্রতিকুলে পর্যন্ত গমন করে।

একজন বিনিদ্রিত লোকের কাছে রাত্রিকে খুবই দীর্ঘ মনে হয় এবং একজন ক্লান্ত ভ্রমণকারীর নিকট তার যাত্রাকে দীর্ঘ মনে হয়। তেমনি, যে ব্যক্তি সঠিক শিক্ষা সম্পর্কে অবগত নয়, মোহ ও দুঃখকে তার কাছে স্হায়ী বলে মনে হয়।

ভ্রমণে গেলে একজন ভ্রমণকারীর উচিৎ সমমানসিকতার বা ভাল মনের একজন সাথীর সাহচর্য নেয়া। বোকা লোকের সাথে ভ্রমণের চেয়ে একা ভ্রমণ করা শ্রেয়।

একজন অবিশ্বস্ত এবং খারাপ বন্ধু হিংস্র বন্য প্রাণী থেকেও ভয়ঙ্কর। একটি হিংস্র প্রাণী মানুষের দেহকে আক্রান্ত করবে, কিন্তু একজন খারাপ লোক মানুষের মনকে আক্রান্ত করবে।

অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন লোক নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল এ চিন্তাই করবে যে, সে কি করে সন্তুষ্টি লাভ করবে। তাই সে ভাবে, "এটি আমার পুত্র, ইহা আমার সম্পদ।" বোকা লোকেরা এরূপ চিন্তা করে কষ্ট ভোগ করে।

সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

বোকা লোক নিজেকে বুদ্ধিমান হিসেবে ভাবার চেয়ে বোকা হিসেবে ভাবাটা উত্তম।

একটি চামচ যেটি খাবার বহন করে, সে কখনো খাবারের স্বাদ বুঝতে পারে না। অনুরূপভাবে, একজন বোকা লোক কখনো জ্ঞানীলোকের জ্ঞান সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে না, যদিও সে ঐ জ্ঞানী ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকে।

সতেজ দুধ প্রায় সময় দইয়ে পরিণত হতে সময় লাগে। অনুরূপভাবে, পাপকর্ম তাৎক্ষণিকভাবে বিপাক প্রদান করে না। পাপকর্ম অনেকটা কয়লার আগুনের ন্যায়, যা ছাইয়ের নীচে লুকায়িত অবস্হায় থাকে এবং শিখাহীনভাবে জ্বলে, যা একসময় বিকটাকারে আগুনের প্রজ্জ্বলন ঘটায়।

একজন মানুষ বোকার মত পদমর্যাদা, পদোন্নতি, লাভ, বা সম্মানের আকাংখায় থাকে। এরূপ আকাংখা কোনভাবেই সুখ বয়ে আনে না; বরং এর পরিবর্তে দুঃখ বয়ে আনে।

একজন ভাল বন্ধু, যে ভুলত্রুটি ও অসঙ্গতি ধরে দেয় এবং খারাপ কাজের জন্য তিরস্কার করে, সে সম্মানের যোগ্য হবে যদি এর পাশাপাশি অন্যের জন্য কিছু মূল্যবান দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

৩। কোন লোক যদি ভাল নির্দেশনা পেয়ে সন্তুষ্ট হয়, সে শান্তিতে ঘুমাতে পারে, কারণ তার মন এর দ্বারা পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।

একজন কাঠ মিস্ত্রী চায় তার বিমগুলো সোজা করে তৈরী করতে। একজন তীর প্রস্তুতকারক চায় তার তৈরী তীরগুলো সম ভারসাম্যপূর্ন হউক। সেচের নালা প্রস্তুতকারী চায় তার খননকৃত নালার পানি সমগতিতে প্রবাহিত হউক। অনুরূপভাবে, জ্ঞানী লোকেরা চায় তাদের মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, যার দ্বারা মন সুষ্ঠুভাবে এবং সঠিকভাবে কাজ করতে পারে।

একটি বৃহৎ পাথরখন্ড বাতাস দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না; তেমনি জ্ঞানীলোকেরাও সম্মান ও তিরস্কারের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন না।

হাজার বার যুদ্ধ জয়ের চেয়ে নিজেকে জয় করা আরো অনেক বড় জয়।

সত্য ধর্ম শ্রবণ করে একদিন বেঁচে থাকা, শত বৎসর জীবিত থাকার চেয়ে উত্তম।

যারা নিজেদেরকে শ্রদ্ধা করে তাদের উচিৎ সর্বদা সচেতন থাকা, যাতে খারাপ তৃষ্ণা দ্বারা আক্রান্ত না হয়। জীবনের যে কোন সময়ে, যুবক অবস্থায়, মধ্য বয়স্ক বা বৃদ্ধ বয়সে হলেও মানুষের বিশ্বাস জাগ্রত করা উচিৎ।

পৃথিবীটা সবসময় লোভ, দ্বেষ ও মোহের আগুনে জ্বলছে; আমাদের উচিৎ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসব বিপদজনক অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করা।

এ পৃথিবীটা জলের বুদবুদের ন্যায়, মাকড়সার জালের ন্যায়, ইহা ময়লা আঁধারে রাখা দূষিত পানির ন্যায়। আমাদের উচিৎ মনের পরিশুদ্ধিতা রক্ষা করা।

৪। যে কোন ধরনের পাপকর্ম হতে বিরত থাকা, কুশলকর্ম সম্পাদন করা, নিজের মনকে পরিশুদ্ধ অবস্থায় রাখা; ইহাই হলো বুদ্ধের শিক্ষার মূল কথা।

ধৈর্য্য হলো সবচেয়ে কঠিন কাজ। কিন্তু ধৈর্য্য যারা ধরতে পারে, শেষ পর্যন্ত বিজয় তারাই লাভ করতে পারে।

যখন কেউ ক্ষুব্ধ বা অসন্তুষ্ট অবস্থায় থাকে, তখনই তার রাগ পরিত্যাগ করা উচিৎ। কেউ যদি দুঃখের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে, তখন প্রথমেই তার মন থেকে দুঃখকে সরিয়ে ফেলা উচিৎ। কেউ যদি লোভে নিপতিত হয়, সে মুহূর্তেই তার লোভকে অপসারণের পদক্ষেপ নিতে হবে। পরিমার্জিত ও অস্বার্থপর জীবন

সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

জীবন যাপন করে, এমন ব্যক্তি আর কিছু না হোক, প্রাচুর্যতার মধ্যে কালাতিপাত করতে পারে।

স্বাস্থ্যবান হওয়া বিরাট এক সৌভাগ্যের বিষয়। যার যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা, বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হওয়ার চেয়েও উত্তম। নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হওয়া, বন্ধুত্বের যোগ্যতার সত্যিকার মাপকাঠি। নির্বাণ অর্জনই হলো সর্বোচ্চ মাত্রার সুখের নিদর্শন।

যখন কারো খারাপের প্রতি অপছন্দ মনোভাব সৃষ্টি হয়, যখন কেউ প্রশান্তি অনুভব করে, যখন কেউ সত্য ধর্ম শ্রবণের প্রতি অনুপ্রাণিত হয় ও আনন্দ খুঁজে পায়, যখন কারো এ কাজগুলোর প্রতি অনুভূতি থাকে এবং প্রশংসা কাজ করে, তারা ভয় থেকে মুক্ত।

যাকে তোমরা পছন্দ করো, তার প্রতি তোমরা আসক্তিপরায়ণ হবে না, আবার যা তোমরা অপছন্দ করো তার প্রতিও বিরূপভাব পোষণ করো না। দুঃখ, ভয় ও বন্ধন এগুলো একজনের পছন্দ এবং অপছন্দ হতেই উৎপন্ন হয়।

৫। লোহা হতে মরিচা জন্মায়, আবার ঐ মরিচা লোহাকে ক্ষয় করে। ঠিক একইভাবে অকুশলও উৎপন্ন হয় নিজের অন্তর থেকে। আবার ঐ অকুশল নিজের দেহকে ধ্বংস করে দেয়।

যে ধর্ম বই আন্তরিকতার সাথে পড়া হয় না, অচিরেই তার ঢালের উপরে ধূলা জমবে। একইভাবে একটি ঘর যদি অব্যবহার্য্য থাকে এবং ঠিকমত মেরামত করা না হয় তাহলে তাও আবর্জনাময় হয়ে পড়বে। অনুরূপভাবে, একজন অলস ব্যক্তিও শীঘ্রই আসক্তিপরায়ণ হয়ে পড়ে।

অকুশল কর্ম মানুষকে কলুষিত করে; কৃপণতা ধার্মিক ব্যক্তিকে কলুষিত করে। অনুরূপভাবে, অকুশল কর্ম মানুষের শুধু ইহজীবন নয়, পরজীবনকেও কলুষিত

করে।

আসক্তির মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হলো অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা। কোন লোকই তার দেহ-মনের পরিশুদ্ধিতা আশা করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা অবিদ্যার হাত থেকে মুক্তি লাভ করতে না পারে।

নির্লজ্জতার মতো পদস্খলন, কাকের ন্যায় ধৃষ্টতা ও দুঃসাহসী হওয়া, অন্যকে আঘাত করে অনুশোচনা না করা খুবই সহজ।

কিন্তু নিরহঙ্কার হওয়া, অপরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, সকল আসক্তি হতে মুক্তি লাভ করা, কাজে এবং চিন্তায় পরিশুদ্ধিতা রক্ষা করা এবং জ্ঞানী হওয়া কঠিনতম কাজ।

অপরের দোষত্রুটি বের করা সহজ কাজ, কিন্তু নিজের ভুলত্রুটি স্বীকার করে নেয়া কঠিন। একজন লোক কোনরূপ চিন্তা ছাড়াই অন্যের অকুশলের কথা ছড়ায়, কিন্তু সে নিজের অকুশলকে গোপন করে, যেমনি একজন জুয়াড়ী অতিরিক্ত পাশা গোপন করে রাখে।

আকাশে পাখি, ধোঁয়া বা ঝড়ের গতিপথকে রোধ করার যেমন কোন ব্যবস্হা নেই; তেমনি অধর্ম শিক্ষা কখনো জ্ঞান অর্জনের পথে নিয়ে যেতে পারে না। এ পৃথিবীতে কোন কিছুই স্হির নয়; কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত মন সবসময় প্রশান্ত থাকে।

৬। একজন দ্বাররক্ষী যেমন প্রাসাদের গেট পাহারা দিয়ে রাখে, তেমনি আমাদের মনকেও বাইরের ও ভিতরের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য পাহারা দিতে হবে। এক মুহূর্তের জন্যও এতে অবহেলা করা উচিৎ নয়।

প্রত্যেকে নিজেই নিজের শিক্ষক। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার উপরেই প্রত্যেকে তাই নির্ভর করতে চায়। সুতরাং প্রত্যেকের উচিৎ নিজেকে নিজে

নিয়ন্ত্রণ করা।

জাগতিক বন্ধন এবং শৃঙ্খল থেকে আধ্যাত্মিক মুক্তির লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হলো, নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করা, অহেতুক কথা বলা থেকে বিরত থাকা এবং গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকা।

সূর্যের আলো দিনকে আলোকিত করে, চাঁদের আলো রাত্রিকে মনোমুগ্ধকর করে, শৃঙ্খলা একজন যোদ্ধার মর্যাদা বৃদ্ধি করে। অনুরূপভাবে, জ্ঞানানুসন্ধানীরা শান্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন ভাবনার দ্বারা অন্যদের চেয়ে সম্মানিত হয়।

যে লোক তার পঞ্চইন্দ্রিয়কে অর্থাৎ চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এবং শরীরকে পাহারা দিয়ে রাখতে না পারে, সে তার চারিপাশের মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। সে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোক নয়। যে দৃঢ়ভাবে তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলোকে পাহারা দিয়ে রাখতে পারে এবং নিজের মনকে স্থিতিশীলতার মধ্যে রাখতে পারে, সেই একমাত্র ব্যক্তি যে সফলতার সাথে জ্ঞান অর্জনে প্রশিক্ষিত।

৭। যে পছন্দ ও অপছন্দের চেতনা দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয়, সে পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। পরিস্থিতির চাপে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে, আবার যে জাগতিক মোহ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে, সে সঠিকভাবে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। তার কাছে তখন সবকিছুই নূতন ও গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়।

সুখ সর্বদা দুঃখকে আহ্বান করে এবং দুঃখ সর্বদা সুখকে অনুসরণ করে। কিন্তু যখন কেউ সুখ এবং দুঃখ, ভাল কাজ এবং খারাপ কাজের মধ্যে পার্থক্য করবে না, তখন সে প্রকৃত মুক্তি কি, তা উপলব্ধি করতে পারবে না।

অতীতের ঘটনা নিয়ে দুঃশ্চিন্তা বা অতীতে ঘটে যাওয়া বিষয়াদি নিয়ে আক্ষেপ করাটা হলো খাগড়ার মতো, যা কাটার পর দিন দিন বিবর্ণ ও শুকনো হয়ে যায়।

দেহ ও মন উভয়ের সুস্থ্যতার জন্য অতীতের কোন কিছুকে নিয়ে অনুতাপ না করা, ভবিষ্যতের কোন কিছুকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তা না করা, এবং কোন ঝামেলা সম্পর্কে পূর্বাভাস না দিয়ে শুধু বর্তমানকে নিয়ে বিজ্ঞতা ও আন্তরিকতার সাথে বাস করা উচিৎ।

অতীতের মধ্যে বাস করা নয়, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার মাঝেও নয়, বর্তমানের মধ্যে মনকে কেন্দ্রীভূত করা আসল কাজ।

সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ কাজ হলো বর্তমান কর্তব্যটি কোন ব্যর্থতা ছাড়া উত্তমরূপে সম্পাদন করা। আগামীকাল করবো এরূপ ভেবে কোন কিছুকে এড়িয়ে যাওয়া বা স্থগিত রাখা উচিৎ নয়। এখনকার কাজ এখন সম্পাদনের মাধ্যমে একজন মানুষ ভালভাবে দিন যাপন করতে পারে।

প্রজ্ঞা হলো সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক এবং বিশ্বাস হলো সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। প্রত্যেকের উচিৎ অবিদ্যারূপ অন্ধকার ও দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করা, এবং পরিশেষে জ্ঞানের আলো অন্বেষণ করা।

যদি মানুষের দেহ ও মন নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাহলে তার উচিৎ এগুলোকে প্রমাণ স্বরূপ বিভিন্ন কাজে প্রয়োগ করা। ইহা হলো তার পবিত্র কাজ। এতে বিশ্বাস তার জন্য সম্পদ হয়ে দাঁড়াবে। সততা, তার জীবনে দেবে মিষ্টি আমেজ এবং সৎ গুণের সঞ্চয় হবে তার পবিত্র কাজ।

জীবন পরিভ্রমণে বিশ্বাস হলো পুষ্টিকর দ্রব্যের ন্যায়, পুন্যকর্মগুলো হলো আশ্রয়স্থল স্বরূপ, প্রজ্ঞা হলো দিনের আলোর ন্যায়, সম্যক স্মৃতি হলো রাত্রিকালীন প্রতিরক্ষা স্বরূপ। যদি কেউ বিশুদ্ধ জীবন যাপন করে, তাহলে কোন কিছুই তাকে ধ্বংস করতে পারে না। যদি কেউ লোভকে জয় করতে পারে, তাহলে কেউ তার মুক্তি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

নিজের পরিবারের জন্যে নিজেকে ভুলে যেতে হবে। তেমনি সমাজের জন্যে

সফলতা অর্জনের ব্যবহারিক পদ্ধতি

পরিবারকে, দেশের জন্য সমাজকে ভুলে যেতে হবে। অনুরূপভাবে, প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের জন্যে পার্থিব সবকিছুকেই ভুলে যেতে হবে।

সবকিছুই পরিবর্তনশীল, সবকিছুই উৎপন্ন হয়, আবার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। জন্ম ও মৃত্যু যন্ত্রণার সীমান্ত অতিক্রম না করা পর্যন্ত পরম সুখ অর্জন দুরূহ কাজ।